সমাজ ও সাহিত্যচিন্তায়

বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা বিষয়ক গবেষণায় সিদ্ধপুরুষ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
অনুজ প্রতিম—

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে

যাঁর প্রেরণা ও তাড়নায় সামান্য লিখি

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তা সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন তিনি ধর্ম বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন। ইংরেজিতে যাকে 'রিলিজিয়ন' বলা হয় তা ঈশ্বর-সম্পর্ক ধারণা এবং উপাসনার রীতি-মাত্র। এই 'রিলিজিয়ন' কথাটির প্রতি-শব্দ হিসাবে ধর্ম ব্যবহার করা চলে না কারণ ধর্মের অর্থ ব্যাপকতর। ধর্ম শব্দটি নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বামীজীও নানা অর্থেই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবে প্রধানত স্বামীজীর রচনায় দুটি অর্থেই ধর্ম শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। "চরম সত্যের বাচক হিসাবে 'ঈশ্বর' শব্দটি স্বামীজীর প্রিয়", সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার পথ হিসাবে তিনি ধর্ম শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং সেদিক থেকে 'ধর্ম' ও 'মোক্ষ' সমার্থক। আবার যা ক্রিয়ামূলক, যা "ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় আনে" অর্থাৎ চতুর্বর্গের অন্যতম হিসাবেও তিনি 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১]

স্বামীজীর ধর্মচিন্তার পটভূমিকা রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তার সূত্র সন্ধানে স্বামীজীর একটি রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব—সেটি হল 'বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন।' এই রচনার প্রথম অংশ 'ধর্ম মীমাংসা'র কয়েকটি সূত্রে তিনি বলেছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি, পরমুহূর্তেই সেই স্থান থেকে অন্যত্র নীত হচ্ছি। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা এবং একই ভাবে বহু মানুষের সমষ্টিরূপ যে সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ভাবেই বহু সমাজের সমষ্টিরূপে মনুষ্যজগতও পরিবর্তনশীল। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টিবোধ, পরলোকবোধ ও কর্মজনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্টি আকারে বিস্তাররূপে কাজে পরিবর্তন হয়ে মানুষের জীবনে ও সমাজে অন্যপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করেছে তার

নাম 'ধর্ম'। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্ম অন্যগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রান্তি বলে মনে করে। যিনি যে মতটি মানেন সেইটিই তাঁর সত্যের সীমা।[২] রামকৃষ্ণ দর্শনের মধ্যে এই অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন "ধর্ম পরিবর্তন মিথ্যা থেকে সত্যে গমন নয়—এক সত্য থেকে সত্যান্তরে গমন। প্রত্যেক প্রচলিত ধর্মই সত্য এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃতি লাভ করবে—সেগুলিও সত্য। সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্যধর্ম। সুতরাং ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয় এবং আরও কি তা জানি না।"[৩]

'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' রচনার একটু ইতিহাস আছে। ১৮৯০ সালের মাঝামাঝি স্বামীজীকে নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ বদ্রীনারায়ণ দর্শন অভিপ্রায়ে নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাত্রা করেন। আলমোড়া পৌঁছবার কিছু আগে পথে এক অশ্বত্থগাছের ছায়ায় বসেছিলেন ভ্রমণ-ক্লান্তি দূর করতে। পাশেই কিছু একটি পার্বত্য ঝরনা—সেখানে দু'জনে স্নান সেরে সেই গাছের তলায় বসেছিলেন ধ্যানস্থ হয়ে। অখণ্ডানন্দ জীবনীতে স্বামী অন্নদানন্দ লিখেছেন, "বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে স্বামীজী অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, 'দ্যাখ গঙ্গাধর, আলমোড়ার এই বৃক্ষতলে, একটা মহাশুভ মুহূর্ত কেটে গেল। আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম বৃহৎ জগৎ ও অণুজগৎ একই সূত্রে গাঁথা। অখণ্ডানন্দের নিকট সুরক্ষিত একটি নোটবুকে স্বামীজী সেদিনের অনুভূতির কথা লিখিয়া রাখেন ; দেখা যায়, স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর প্রধান কথাগুলি এখানে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ।"[৪]

স্বামী নির্বেদানন্দ 'বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি' প্রবন্ধে সেদিনের ঘটনার কিছু বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সেদিনকার তারিখ দিয়ে দিনপঞ্জীতে কিয়দংশ লিখে রেখেছিলেন, 'বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ড উভয়ই একই কল্পনায় রচিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন প্রাণীর দেহাবরণের মধ্যে রয়েছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি চেতন গতির দৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরে রয়েছেন—ইহা কল্পনামাত্র নয়। সেই কর (আত্মার) অপরের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে থাকার উপমা দেওয়া

চলে—ভাব ও ভাবের প্রকাশক ভাষার মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে। ভাব ও ভাষা অভিন্ন, আমরা শুধু কল্পনাতেই এদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে পারি। শব্দ ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব। এইজন্য 'প্রথম শব্দের উৎপত্তি' ইত্যাদি (শাস্ত্রবাক্য রয়েছে)। বিশ্বাত্মার এই দ্বিত্বভাব চিরন্তন। কাজেই আমরা যা কিছু ধারণা করি বা অনুভব করি, তা সবই হচ্ছে এই নিত্যসাকার ও নিত্যনিরাকারের সম্মিলন।" স্বামী নির্বেদানন্দের অভিমত "দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তো রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি এইরূপই ছিল। মানুষের সঙ্গে তাঁর সর্ববিধ আচরণও তো প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।···শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা জীব ও শিবের একত্ব এতদিন তাঁর বুদ্ধি অনুমোদিত বিষয়মাত্র ছিল, এখন (নিজের) স-জ্ঞার আলোকসম্পাতে সে সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। আজ ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নরূপ মহাসত্যটি তাঁর উপলব্ধিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—তাঁর অন্তর্মুখ মনের সঙ্গে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মানবসেবা-ব্রতের সামঞ্জস্য বিধানের কাজে এই উপলব্ধি সহায়ক হতে পারবে।"[৫]

এই অখণ্ডানুভূতিই বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার মূলভিত্তি এবং তাঁর সমাজচিন্তারও প্রেরণা। 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম বিষয়ে শিখাইবার আর বেশি আছে কি? কেবল বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপরে বিশ্বাস। শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ এই একত্ব অনুভব করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে।···অতএব নানা জগৎ, নানা জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন।"[৬]

স্বামীজীর ধর্মসংক্রান্ত চিন্তার পরিধি বহুবিস্তৃত। তাঁর সমগ্র চিন্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়—স্বল্পপরিসরে সম্ভবও নয়। আমি সংক্ষেপে তাঁর চিন্তার মূলসূত্রগুলিকেই উপস্থিত করব মাত্র। প্রথমেই আসে যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কথা। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, "বিবেকানন্দ চারঘোড়ার গাড়ির মতো—প্রেম, কর্ম, জ্ঞান ও শক্তি, সত্যের এই চারিটি পথের লাগাম ধরিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে

একই সঙ্গে চালাইয়া লইয়া ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।"[৭]

প্রথমেই আসি কর্মযোগের আলোচনায়। কর্ম কি ? বিবেকানন্দের মতে, "আমাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি—সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত, এই আঘাত সমষ্টিকেই বলে কর্ম।...অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। আমি কথা বলিতেছি, ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছ—তাহাও কর্ম। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছি—ইহা কর্ম, কথা কহিতেছি কর্ম, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি সবই কর্ম।"[৮]

এই নিত্যক্রিয়াশীলতা থেকে সাধারণ মানুষ কখনও দূরে সরে থাকতে পারে না—প্রতিনিয়তই কর্তব্যের দায়িত্বে তারা বদ্ধ হয়ে আছে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী কর্ম-আবর্তকে একটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন : "এই সংসার 'চক্রের ভিতরে চক্র'—এ বড় ভয়ানক যন্ত্র...। আমরা সকলেই ভাবি কোনো বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমরা বিশ্রাম লাভ করিব, কিন্তু কোনো বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই দেখি, আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বিশাল ও জটিল জগৎযন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে ; একটি—এই যন্ত্রের সহিত সংশ্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়া দাঁড়ানো, সকল বাসনা ত্যাগ করা। ইহা বলা খুব সহজ কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব...আর একটি উপায়, এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া—ইহাকেই কর্মযোগ বলে। যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না ; উহার ভিতরে থাকিয়া কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়া যথাযথভাবে কর্ম করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া ইহার বাহিরে যাইবার পথ।"[৯]

প্রকৃতপক্ষে সাংসারিক কর্মকে অধ্যাত্মসাধনায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতির নামই কর্মযোগ। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তি-

যোগ প্রভৃতি সকল পথের নির্দেশ দিলেও বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন কর্মযোগের উপর। তার কারণ অর্জুনের সমসাময়িক অবস্থা বিচারে এর প্রয়োজনীতা, কিন্তু সমগ্র সংসারে কর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে যে আপাত বিরোধ আছে সেটির মীমাংসাই ছিল তাঁর বক্তব্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বামীজী গীতার এই আদর্শের প্রতিধ্বনি করেছেন, "সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই তোমার অধিকার---ফলে নয়।··· কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিতে পারে।··· কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে বলিয়া যে ভালো কাজ করে সে-ও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে।···আমরা যদি মনে করি এই কর্মের দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে স্বর্গ-নামক একটি স্থানে আসক্ত হইব।··· অতএব একমাত্র উপায়--সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া।"[১০]

পরোপকারের মধ্য দিয়েই মানুষ কর্মযোগের প্রকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করতে পারে। স্বামীজীর চিন্তায় পরোপকার পরোক্ষভাবে স্ব-উপকার মাত্র। পরোপকারের সঙ্গে যেখানে প্রত্যুপকার লাভের বাসনা জড়িয়ে আছে, সেখানেই দুঃখ। স্বামীজী বলেন, "আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি···এইরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা মূর্খের চিন্তা, আর ঐরূপ চিন্তা দুঃখজনক। আমরা মনে করি আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি এবং আশা করি সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে ; আর সে ধন্যবাদ না-দিলে আমরা মনে কষ্ট পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে সাহায্য করিতেছ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও—তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর। মানুষকে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়?"[১১] উপনিষদের অন্যতম প্রধান বক্তব্য আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতেই পরমাত্মাকে জানা সম্ভব এবং সেই একাত্মতার মধ্য দিয়েই মানুষ আপন অভীষ্টে পৌছতে পারে।

"মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি"—মানবপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান বিবেকানন্দের এই বাণীই তাঁর সর্বোত্তম আদর্শ। "তিনিই সব—সকলের মধ্যেই তিনি।" বিশ্বজগতের প্রতি এই শ্রদ্ধার দৃষ্টি থেকেই আসে সম্পূর্ণ অনাসক্তি। স্বামীজীর নির্দেশ, "ইহাই তোমার কর্তব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব। কর্মযোগ এই রহস্যই আমাদের শিক্ষা দেয়। ...কর্মযোগের অর্থ কি? উহার অর্থ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে তোমাকে প্রতারণা করুক কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না এবং তুমি যে কিছু ভালো কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরী করিও না অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[১২] সন্ন্যাসীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, নির্বাসনা কঠিন সন্দেহ নেই কিন্তু যিনি কর্মের মধ্য দিয়া গৃহীরূপে জাগতিক প্রলোভনের মধ্যে থেকে এই আদর্শ রক্ষা করতে পারেন তাঁর পথ কঠিনতর। ত্যাগীর জীবন ও কর্মযোগীর জীবন সমভাবে আয়াসসাধ্য। এই অখণ্ডানুভূতি ও নিষ্কাম কর্মাদর্শ স্বামীজীর সমাজচিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে।

কর্মযোগের দুটি অঙ্গ—সক্রিয়তা এবং চিত্তসাম্য। কর্মযোগীর কর্মের ক্ষেত্রে চাই দুর্দম অধ্যবসায়, অপরাজেয় উদ্যম সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির-চিত্ততা, শাশ্বত প্রশান্তি। আপাতবিচারে মনে হয় এই দুইটির একত্র সমাবেশ এক অসম্ভব কল্পনামাত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিত্তবিক্ষোভ ও চিত্তচাঞ্চল্যের মূল কারণটি কর্ম নয়, ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। আমরা কর্ম করি লাভ বা প্রতিদানের আশায়—যখন সেই প্রতিদান আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লাভ না করি তখন দেখা দেয় ক্ষোভ, বেদনা, দ্বেষ, কপটতা। "প্রত্যেকটি নিষ্কাম কর্ম চিত্তের স্থৈর্য, শুচিতা ও দৃষ্টি প্রাখর্যের উৎকর্ষ সাধন করে এবং শুধু এই প্রকার কর্মের প্রভাবে পরিণামে আসে তত্ত্বজ্ঞান ও সেইজন্য চিরমুক্তি।"[১৩]

রাজযোগকে পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন বিবেকানন্দ। রাজযোগ মনস্তাত্ত্বিক যোগ। মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। রোমাঁ রোলাঁর মতে "যোগের রাজা রাজযোগ। উহার এই রাজসিক লক্ষণ হিসাবে উহাকে কেবল যোগ নামেই অনেকসময় অভিহিত করা হয়, অন্য কোনোও নাম বা বিশেষণের প্রয়োজন থাকে না। উহা যোগোত্তম।"[১৪]

আটটি আনুক্রমিক সাধনের সমবায়ে সাধ্য বলে রাজযোগকে অষ্টাঙ্গ-যোগও বলা হয়। এই আটটি সাধন হল— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম ও নিয়মের উদ্দেশ্য হল নৈতিক শুচিতা। যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। আর নিয়ম হল—শৌচ, সন্তোষ, তিতিক্ষা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ।

এর পরবর্তী অঙ্গ 'আসন' একরকম শারীরিক ব্যায়াম যার দ্বারা মেরুদণ্ড ঋজু এবং মাথা বুক ও ঘাড় একটি সরল রেখায় ধারণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। 'প্রাণায়াম' হল শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জন পদ্ধতি এবং তার দ্বারা একাগ্রতা সম্পাদন। আসন ও প্রাণায়ামের লক্ষ্য মনকে অন্তর্মুখী করে তোলা।

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করার নামই 'প্রত্যাহার'। বহিরিন্দ্রিয়-গুলির সক্রিয়তা নির্ভর করে অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর, শাস্ত্রীয় ভাষায় যার নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—সব কিছুরই সংবেদন ঘটে বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগে। 'প্রত্যাহারের' উদ্দেশ্য, এই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করা মন শান্ত ও সংযত করা। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মন স্থিরবিন্দুতে আনার চেষ্টা করা হয় তারই নাম 'ধারণা'। ধারণা ক্রমশঃ পরিণত হয় ধ্যানে এবং ধ্যানাভ্যাসের দ্বারাই একাগ্রতার চরম উৎকর্ষ 'সমাধি'।

রাজযোগ সাধনার সুকঠিন পথে ভ্রষ্ট যোগীরা সাধারণ মানুষকে চমৎকৃত এবং বিভ্রান্ত করার জন্য রহস্য ও প্রচ্ছন্নময়তার সৃষ্টি করেন। ধনসম্পদলাভ ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে যোগীরা

লক্ষ্যচ্যুত হন—তখনই অলৌকিক ভেলকিবাজী ও রহস্যময়তার আবির্ভাব। বিবেকানন্দের স্পষ্ট সতর্কবাণী : "ভারতবর্ষে নানাকারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখা যাইতেছে ; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না।

"এই সব যোগপ্রণালীতে গুহ্য ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে তাহা বর্জন করিতে হইবে। যাহা কিছু বলপ্রদ তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাগ কর। রহস্য স্পৃহাই মানবমস্তিষ্ক দুর্বল করিয়া ফেলে। ইহারই জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যোগশাস্ত্র প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ...আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানাপ্রকার রহস্যের কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়া পড়িল—তাহারা ইহাকে গোপনীয় বিদ্যা করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ্য দিবালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না।"[১৫]

রাজযোগ দেবত্ব বিকাশের সাধনা কিন্তু পথ বিপদসঙ্কুল। বিবেকানন্দের চিন্তা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত : "আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহার ভিতর গোপনীয় কিছুই নাই।...অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায় ; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে ; সাধন করিয়া দেখিতে হইবে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য কিনা। অন্যান্য বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর ঠিক সেই প্রণালীতেই এই বিজ্ঞান শিখিতে হইবে।"[১৬]

রাজযোগের মূল লক্ষ্য হল আত্মসংযম, যার জন্য প্রয়োজন মনকে সবলে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্মুখী করে তোলা আর জ্ঞানযোগের পথ হল সত্যকে বিচার করে তার বিরোধী ভাবগুলিকে মন থেকে নির্বাসিত করা। সংযম ও অসীম মনোবলের অধিকারী, বিচারপ্রবণ মানুষই জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। স্বামীজী

বলেছেন, "ধর্ম বুঝিবার জন্য মানবমনের যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব কারণ অসম্পূর্ণ যুক্তি নিজস্ব মূলভিত্তির অনুধাবন করিতে পারে না। অতএব মনকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল প্রকৃত তথ্যে পৌঁছানো, তবেই বুদ্ধি সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া মূল নীতিসমূহের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে···প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার নিশ্চিত উপায় জ্ঞানযোগ।"[১৭]

জ্ঞানযোগের ভিত্তি বেদের কর্মকাণ্ডের উপর। উপনিষদের প্রধান বক্তব্য হল, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি। সুতরাং আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতে পরমাত্মাকে জানা সম্ভব এবং তখনই আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যের মধ্যে দিয়ে সঠিক অভীষ্টে পৌঁছতে পারা যায়।

জ্ঞানযোগ সাধনার অধিকার লাভের জন্য 'সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন' হওয়া প্রয়োজন। 'সাধনচতুষ্টয়' বলতে বোঝায় ষট্ সম্পত্তি (যথা—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান), নিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রফল, বিরাগ, এবং মুমুক্ষুত্ব।

জ্ঞানযোগের সাধকের ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে রেখে সকল অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান অবশ্য কর্তব্য। জীবনে যত দুঃখই আসুক না কেন তাকে অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করা সাধনার অধিকার লাভের অন্যতম শর্ত। নিত্য ও অনিত্যবস্তুর পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতনতা আবশ্যিক। নিজের ও শাস্ত্রবাক্যের উপর শ্রদ্ধা এবং মনের একাগ্রতা সর্বক্ষণ রক্ষা করে মোক্ষলাভের জন্য তীব্র আগ্রহ এবং সাধনায় একনিষ্ঠা সাধনার অধিকার লাভের যোগ্য করে তোলে।

স্বামীজী ষট্ সম্পত্তির ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র। চক্ষু ও কর্ণ দর্শন ও শ্রবণের যন্ত্রমাত্র···"ইন্দ্রিয়-গুলি যদি কোনো কারণে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে চক্ষু ও কর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সুতরাং মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথম এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। বাহ্য ও অন্তর বিষয়ে মনের গতি রোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে

স্থাপন করা—ইহাই হইল 'শম' ও 'দম' শব্দের প্রকৃত অর্থ।"[১৮]

তিতিক্ষার সাধনাকেই স্বামীজী 'দুঃসাধ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা। তার জন্য অন্তরে দুঃখবোধ দেখা দিতে পারে—তা থেকেই ক্রোধ বা ঘৃণার উৎপত্তি। 'তিতিক্ষা'র আদর্শে ঘৃণা বা ক্রোধের স্থান নেই। "আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে যেন কিছুই ঘটে নাই।...দুঃখ প্রতিরোধ করিবার বা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া মনের মধ্যে কোনো প্রকার দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রাখিয়া সর্ববিধ দুঃখের যে দহন তাহাই তিতিক্ষা।"[১৯]

'উপরতি'র অর্থ "ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি চিন্তা" না-করা। যা দেখা যায় বা শোনা যায়, যা আমাদের দৈহিক প্রয়োজন মেটায়—সেগুলির চিন্তায় আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। এগুলি সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি চিন্তা করি বা কথা বলি। জ্ঞানমার্গের সাধকের এ অভ্যাস ত্যাজ্য।

ষট্ সম্পত্তির অন্যতম 'শ্রদ্ধা' বলতে বোঝায় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস এবং তাঁকে লাভ করার জন্য প্রগাঢ় আগ্রহ। স্বামীজীর ব্যাখ্যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস—ঈশ্বরলাভের জন্য সুতীব্র আকূতি যখনই মানুষকে উন্মাদ করে তোলে তখনই শ্রদ্ধার চরমরূপ প্রকাশ পায়। "সমাধান অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করিবার নিয়ত অভ্যাস। কোনো কিছুই একদিনে সম্পন্ন হয় না। ধর্ম একটি বটিকার আকারে গিলিয়া ফেলা যায় না। ইহার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলনের দরকার।"[২০]

সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, "কেবল ঈশ্বরই নিত্য, আর সব কিছু অনিত্য। সব কিছুই মরে—দেবদূত, মানুষ, জীবজন্তু সব মরে—পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব ধ্বংস হইয়া যায়।...অদ্যকার পর্বতগুলি অতীতে মহাসাগর ছিল; আগামীকাল তাহারা মহাসাগরে পরিণত হইবে...সমগ্র বিশ্বই পরিবর্তনের একটি পিণ্ড। কিন্তু এক অপরিণামী বস্তু আছেন, তিনিই ঈশ্বর। আমরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, পরিবর্তন আমাদের তত

কম হইবে, প্রকৃতি তত কম আমাদের উপর ক্রিয়া করিবে। আমরা যখন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব, তাঁহার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিব, তখনই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিব।"[২১]

মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা। স্বামীজী এক বৃদ্ধ সৈনিকের কাহিনী বিবৃত করে মানুষের বন্ধন দশার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষাট বৎসর কারারুদ্ধ থাকার পর মুক্তিলাভ করে সেই বৃদ্ধ আকুল আবেদন জানিয়েছিল কারাগৃহে প্রত্যাবর্তনের। "মানুষ মাত্রেরই ঠিক এইরূপ অবস্থা। আমরা উদ্দামগতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমরা অনিচ্ছুক।...তুমি ও আমি প্রকৃতির দাসরূপে, সম্পদের দাসরূপে স্ত্রীপুত্র পরিজনের দাসরূপে জন্মিয়াছি: এবং আমরা এইভাবেই একটি কল্পিত অবাস্তব তৃণগুচ্ছের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতেছি, অথচ যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি তাহা পাই না।"[২২]

"জ্ঞানের সাধক চান মুক্তি...এই সব দাসত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিলেই মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগে, মুক্তির একটি উদগ্র বাসনা আসে। একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা একজনের মাথায় স্থাপিত হইলে ইচ্ছা দূরে ফেলিয়া দিবার জন্য সে কিরূপ চেষ্টা করে! যে ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে, সে প্রকৃতির ক্রীতদাস—তাহার মুক্তির সংগ্রামও এইরূপ হইবে।"[২৩]

উপযুক্ত অধিকার লাভের পর জ্ঞানযোগ সাধকের জন্য তিনটিমাত্র সাধন অঙ্গ নির্দিষ্ট হয়েছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথম সিদ্ধগুরুর কাছে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ পরে অতিসূক্ষ্ম বিমূর্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের ধারণার জন্য দীর্ঘকাল অনন্যমনা হয়ে তীব্র চিন্তা। প্রাকৃত অবস্থায় আমাদের বহু চিন্তাই অসম্বদ্ধ—মননের দ্বারা ঐগুলি সংশোধন প্রয়োজন। সবশেষ সাধনাঙ্গ নিদিধ্যাসন। মননের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে সাধক সমস্ত বিষয় থেকে মন সরিয়ে নিয়ে 'আমি সাক্ষীমাত্র' এই চিন্তায় সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করেন। এই অভিনিবেশ যখন একান্ত নিবিড় হয় তখন সমস্ত জগৎ লীন হয়ে সাধক পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। এই অবস্থাকেই বলে 'নির্বিকল্প সমাধি'।

ভগবানকে ভালোবেসে তাঁকে লাভ করা যায়, এই সত্যটি ভক্তিযোগের ভিত্তি। ভক্তিযোগ অন্য যোগের তুলনায় সহজসাধ্য কারণ শারীরিক এবং মানসিক অনুশীলন ছাড়াই এই যোগসাধন সম্ভব।

হৃদয়ের মূলবৃত্তি ভালোবাসা—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই বৃত্তির প্রভাব। সেই ভালোবাসাকে যদি ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলা যায় তাহলে অন্য কোনোও সাধন অঙ্গের সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে ভালোবাসার ঈশ্বরাভিমুখী সহজ বলে মনে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা সহজ নয়। বিষয়াশক্তির কণামাত্র থাকলে ঈশ্বরে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না। ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসাকে বলা হয় পরাভক্তি। পরাভক্তি দীর্ঘ অনুশীলনেই সম্ভব হয় ওঠে। এর জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তাকে বলা হয় গৌণীভক্তি। ব্রহ্ম থেকে তৃণ-গুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র সত্তায় শ্রীভগবানকে দর্শন করার আন্তরিক উদ্যমই গৌণীভক্তি।

"ধর্ম অর্থে উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি" কিন্তু "শিশুরা যেমন প্রথমে স্থূল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয়, সেইরূপ উচ্চতম অনুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রথম স্থূল অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। পাঁচ-দুগুণে দশ বলিতে একটি ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না কিন্তু যদি পাঁচটি করিয়া জিনিস দুইবার লইয়া দেখানো যায় মোট দশটি জিনিস হইয়াছে, তাহা হইলে সে বুঝিবে।"[২৪] সূক্ষ্মের ধারণালাভ দীর্ঘ সাধনার পরই সম্ভব। প্রাথমিক অবস্থায় ধর্মরাজ্যে বয়স্ক মানুষও শিশুর মতো। তখন "প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম"। সুতরাং সেই অবস্থায় স্থূলবস্তু অবলম্বন করেই অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথমিক অবস্থায় মূর্তি, স্তবস্তুতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বর বিশ্বরূপে, সর্বভূতে বিরাজিত, তিনি রূপাতীত। কিন্তু মানুষ সেই সর্বব্যাপী রূপহীন ঈশ্বরকে সহজে নিজের কল্পনার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ধারণ করতে পারে না তাই তার প্রয়োজন রূপের গণ্ডীবদ্ধ কোনোও বস্তুকে। তাই বিশ্বরূপের খেলাঘর থেকেই সে তার পরিচিত এবং

কাঙ্ক্ষিত প্রতীকটি বেছে নেয়। এটাই সুসাধ্যতম পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে সকলের ধারণা যে একই পথ ধরে চলবে এটা আশা করা যায় না কিন্তু একজনের মতের সঙ্গে অন্যের মতপার্থক্য ঘটলেই অন্যপক্ষ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত, "আমার ধর্ম আপনার বা আপনার ধর্ম আমার হইতে পারে না···রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয় আর যদিও পথ অনেক তথাপি সব পথই সত্য ; কারণ পথগুলি একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।···এই নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় 'ইষ্ট' বলে।"[২৫]

ভক্তিপথের উপাসকদের স্বামীজী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(১) নাম উপাসক (২) প্রতীক উপাসক ও (৩) দেবমানব উপাসক। বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নাম-উপাসনা। ঈশ্বরের নাম পবিত্রতম এবং অনেকের বিশ্বাস নামই ঈশ্বর। "আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন ?" বিবেকানন্দের প্রশ্ন। "শব্দ ও ভাব অভিন্ন।···প্রত্যেক ব্যষ্টি দেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে।··· মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায়, মানুষের চিত্তের মধ্যে রূপজ্ঞান ব্যতীত নামজ্ঞান আসিতে পারে না।···এই কারণে সমগ্র জগতে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়।"[২৬]

এই নাম থেকেই নামী বা তার প্রতীকের চিন্তার উদ্ভব। মানসিক গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে নানা ধারণা গড়ে তোলে। জীবজন্তুরা যদি ঈশ্বরকল্পনা করার চেষ্টা করে তাহলে তার পরিচিত পরিমণ্ডল অর্থাৎ জীব-জগতের মধ্য হতেই ঈশ্বরের আকৃতি অন্বেষণ করবে এবং এটাই স্বাভাবিক রীতি। প্রত্যেকেই যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। সে পাত্রগুলি জলপূর্ণ করলে জল পাত্রেরই আকৃতি গ্রহণ করে কিন্তু সবগুলি পাত্রেই জল ভিন্ন আর কিছু নেই।

ভক্তিযোগের তৃতীয় পথ অর্থাৎ দেবমানব উপাসনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী আলোকের রূপকল্পটি গ্রহণ করে বলেছেন, "আলোকের স্পন্দন সর্বত্রই রহিয়াছে—অন্ধকারেও আলো আছে। ঐ আলোকের স্পন্দন একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যথা প্রদীপ, সূর্য, চন্দ্র

প্রভৃতিতে মানুষের চক্ষুস্নায়ুতে আলোক অনুভূত হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সর্ব প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু মানুষ তাহাকে মানুষের ভিতর দিয়া চিনিতে পারে। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য মানুষের দিব্যমুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয় তখন —কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে।" এই মানবরূপী ঈশ্বরকে ভালোবাসা সহজতর পদ্ধতি। নিরাকার, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আমরা দূর থেকে প্রণাম জানাতে পারি কিন্তু একান্ত প্রিয়জনের মতো ভালোবাসার বন্ধনে বদ্ধ করতে পারি না—সেখানে শ্রদ্ধা আছে, ভীতি আছে কিন্তু ভালোবাসা নেই। আত্মীয়তাবোধ থেকেই ভালোবাসা জন্ম নিতে পারে। ঈশ্বর যখন মানুষরূপে আমাদের কাছে ধরা দেন তখন তাঁর মানবিক আচরণগুলির দ্বারা তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে যান---যাঁকে শ্রদ্ধা করা যায় আবার ভালোবাসাও যায়। তাই মানুষের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারে নিজের কল্পনাশক্তিকে খুব বেশি পীড়িত করার প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মমতেই কোনো না কোনো ভাবে সগুণ-ঈশ্বর বিশ্বাস দেখা যায়। সাধনার প্রাথমিক স্তরে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য। সাকার পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও অপরের উপাস্য দেবতার ক্ষেত্রে যে বাদানুবাদ বর্তমান সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ সচেতন। তাঁর অভিমত, "আমাদিগকে এই সকল শিশুজনোচিত ধারণা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে, আমাদিগকে অজ্ঞানোচিত বৃথা বাদানুবাদের উচ্চে উঠিতে হইবে···দেখিতে হইবে সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাণী, ধীরে ধীরে আলোকের অভিমুখে আবর্তিত হইতেছে। উহা যেন আশ্চর্য বৃক্ষশিশু ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া এক অমূর্ত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে সত্যের নাম ঈশ্বর।···উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি—প্রথম ঘূর্ণন সর্বদা জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার উপায় নাই।"[২৭] সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী অস্বীকার করেন নি কিন্তু অজ্ঞানজনোচিত ক্রিয়াকলাপকে 'পৈশাচিক শক্তি' বলে অভিহিত

করেছেন। স্বামীজীর সুস্পষ্ট সতর্কবাণী, "অজ্ঞানজনোচিত অলৌকিক শক্তির বিকাশ নয়, আত্মার অদ্ভুত শক্তি আমাদের চাহিতে হইবে—যাহা মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহার দাসত্ব তিলক দূর করে এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।"[২৮]

স্বামীজীর ধর্মচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনি চারটি যোগ সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্যসূত্র নির্ধারণ করেছেন। ঈশ্বর-সাধনার বিভিন্ন পথ যে পরস্পরবিরোধী নয় পরন্তু একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত স্বামীজীর বক্তব্যে তা সুপরিস্ফুট। "কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ—সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়।··· অজ্ঞেরাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নয়। জ্ঞানীরা জানেন, আপাতত পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত ঐ দুই পথ মানুষকে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।"[২৯]

ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে স্বামীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান **Practical Vedanta** বা কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ। অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবধানের যে ধারণা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় স্বামীজীর কর্মে পরিণত বেদান্ত বা কর্মজীবনের সঙ্গে বেদান্তের সংযোগ স্থাপনা সেই ধারণা মুছে দিয়েছে। লণ্ডনে চারটি বক্তৃতায় তিনি **Practical Vedanta** তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতামালার ভূমিকা-স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে তাহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন···ধর্মের আদর্শসমূহ সমস্ত জীবনকে যেন অচ্ছাদন করে আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।"[৩০]

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ সর্বভূতে এক আত্মার উপলব্ধি সাধনা

সাপেক্ষ বলেই প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। সেই আরণ্যজ্ঞানকে লোকালয়ের উপযোগীরূপে সর্ব-সাধারণের কাছে উপস্থিত করেছেন বিবেকানন্দ—এইখানেই তাঁর উদারতা ও অভিনবত্ব। স্বামীজী মনে করেন এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ আপন মহত্ত্ব উপলব্ধি করে দুর্বলতার উর্ধ্বে ওঠার সুযোগ লাভ করবে।

জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বিবরণী সভা (Anti Vivisection Society)-র একজন সভ্যের সঙ্গে তাঁর আলাপচারীর বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁদের চিন্তার ত্রুটির দিকটি নির্দেশ করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি সেই ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?" সভ্যটি উত্তরে বলেছিলেন, "জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু পশুগুলি আমাদের খাদ্যের জন্যই সৃষ্টি।" স্বামীজী মনে করেন, বাস্তবিক "পশুগুলিও তো সেই অখণ্ড সত্তারই অংশ। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশুর জীবনও অমর। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—প্রকারগত নয়।···আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ প্রভেদও দেখা যায় না।···তুমি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমাকে জানিতে হইবে নিম্নতম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান—তাহা না হইলে প্রতিপন্ন হয় ভগবান মহা-পক্ষপাতী। যে ভগবান মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন আর পশুনামক তাঁহার সন্তানের প্রতি এত নির্দয় তিনি মানুষ অপেক্ষাও অধম।···বাস্তবিক কথা এই, আমরা খাইতে চাই তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি কিন্তু আমি নিরামিষ ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই তখন আমি জানি আমি অন্যায় করিতেছি···আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংস ভোজন না করা, কোনো প্রাণীর অনিষ্ট না করা কারণ পশুমাত্রই আমার ভাই, বিড়াল কুকুরও—যদি তাহাদিগকে এইরূপ

ভাবিতে পারো তবে তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের দিকে একধাপ অগ্রসর হইয়াছ—মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের তো কথাই নাই।"[৩১]
ছান্দোগ্য উপনিষদে পাঞ্চালরাজ-শ্বেতকেতু উপাখ্যানে দেখা যায় রাজা শ্বেতকেতু বলেছিলেন, অগ্নিতে আহুতি দান এবং উপাসনা বাস্তবিকপক্ষে অত্যন্ত নিম্নস্তরের বস্তু—মনুষ্যশরীরই সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি। সুতরাং ধর্মকে কর্মের পরিধির মধ্যে স্থাপন করাও অসম্ভব নয়। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত, "মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকর ও সহায়ক হইতে পারে কিন্তু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানবপ্রতিমা তো রহিয়াছে।" ঈশ্বর উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ প্রচলিত ও সাধারণ রীতি কিন্তু "মন্দির অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির"-কে গ্রহণ করাই বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।[৩২]
"যে মুহূর্তে তুমি বল 'আমি আছি' সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বর খুঁজিতে যাইবে যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, সকল প্রাণীর মধ্যে দেখিতে না পাও?···মানবআত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্যান্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল।"[৩৩]
বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে মানুষই দেবতার রূপকলাকার, সে রূপকল্পনা আপন প্রতিরূপের ভিত্তিতে। "তোমরাই তোমাদের নিজেদের বাইরে প্রক্ষেপ করিয়াছ—তোমরাই মূল, তোমরাই প্রকৃত উপাস্য।···এক কথায় বেদান্তের আদর্শ, জগতে মনুষ্যের উপাসনা আর বেদান্তের ঘোষণা যদি তুমি ঈশ্বরের প্রতিরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার তবে অন্য কোথাও তোমার অন্য কিছু উপাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।" উপসংহারে স্বামীজী আবেদন জানিয়েছেন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে, "এস, আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুই উপাস্য হইবে।"[৩৪]

১৮৯৮ সালের ১০ জুন তারিখের একটি পত্রে বিবেকানন্দ মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখেছিলেন, "আসল কথা এই যে অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে উহাই ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে... কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহা হিন্দুদিগের মধ্যে সার্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টি লাভ করে নাই।"[৩৫]

যা বেদান্তের তত্ত্বমাত্র ছিল, তাকেই স্বামীজী জীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত করে এক বিশ্বজনীন নবধর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই আদর্শের একদিকে আছে আধ্যাত্মিকতা—অন্যদিকে আছে জাগতিক প্রয়োজনীয়তা এবং সে জগতের পরিধি ভৌগোলিকভাবে খণ্ডিত নয়। স্বামীজী ধর্মকে যেমন 'মোক্ষপথ' অর্থে গ্রহণ করেছেন তেমনি ইহলৌকিক-পারলৌকিক অভ্যুত্থানের সোপানরূপে চতুর্বর্গের অন্যতম হিসাবেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে 'ধর্ম' ও 'মোক্ষের' পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ লিখেছেন, "ধর্ম কি? যা ইহলোক ও পরলোকের সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি? যা শেখায়, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।...অতএব মুক্ত হতে হবে—প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না।...ফলকথা এই যে দেশের লোকের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ওই ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই, কিন্তু তা হয় না। ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।...দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল—না এদিক না ওদিক...জাতি, ব্যক্তি, প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম সবই আলাদা।...তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশি

আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর—একথা বলেছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই, একহাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন, ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড় কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।...অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার এক গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।...হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। একথা সত্য, এটি ভোলবার কথা নয়।"[৩৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে ভেদ বা বিরোধিতা কিছু নেই। মানুষের জীবনে মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা যতখানি, ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও তার চেয়ে কম নয়। অধিকারী ভেদে উভয় পথই গ্রহণযোগ্য এবং একটির মধ্যে দিয়েই অপর পথটি উন্মুক্ত হতে পারে। গৃহস্থ ধর্মচর্চার মধ্যেই সন্ধান পেতে পারে মোক্ষপথের। যখন সে পথের অধিকার লাভ করে তখন আর ইহলৌকিক-পারলৌকিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু গৃহস্থ হিসাবে তার কতকগুলি আচরণীয় কর্তব্য আছে—সেগুলিই স্বধর্ম। স্বামীজী তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছেন, "অন্যায় কোর না, অত্যাচার কোর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ গৃহস্থের পক্ষে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহাউৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী, পরিবার, দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার মোক্ষ?[৩৭]

স্বামীজী সন্ন্যাসী, কিন্তু গার্হস্থ্য ধর্মকে কি অস্বীকার করেন নি। আদর্শ গৃহীর পথকে তিনি সুনির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র।...যতক্ষণ সে ব্যক্তি কার্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল?"—সুতরাং ভোগের

পথে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই অগ্রসর হবে। তবে দু'রকম ভোগ—সুখভোগ ও দুঃখভোগের মধ্যে সুখভোগটাই বাঞ্ছনীয়। কুকাজের চেয়ে সু-কাজের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভাল। কর্ম যখন অনিবার্য তখন সু-কার্যের মধ্য দিয়েই সুখভোগের পথই প্রকৃত গৃহীর পথ। মোক্ষ-পথের পথিকের পক্ষে যা আচরণীয় ধর্মপথের পথিকের পক্ষে তা নয়। সেই কর্মপথে হয়ত কিছু অন্যায়, কিছু পাপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। স্বামীজী বলেন, "এলই বা, উপোষের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভালমন্দ মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে আর দেওয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয় আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।[৩৮]

এই প্রসঙ্গেই একটি সাধারণ ভ্রান্তি দূর করেছেন তিনি। কর্মে অনাসক্তি এবং উদ্যমহীনতাকে অনেকে সাত্ত্বিকতার লক্ষণ বলে মনে করেন। স্বামীজী সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিনটি অবস্থার তারতম্য বিচার করেছেন। রজঃ প্রাধান্যে মানুষ ক্রিয়াশীল, কিন্তু সত্ত্ব ও তমঃ প্রাধান্যে নিষ্ক্রিয়। সত্ত্ব প্রাধান্যের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে তমঃ প্রাধান্যের জড়তার পার্থক্য বিপুল। সাত্ত্বিক মানুষের শান্তভাব মহাশক্তির পরিচয়। সাত্ত্বিক অবস্থায় মানুষের নিজের হাতে কাজ করার প্রয়োজন হয় না—তার ইচ্ছাশক্তিতেই সব কাজ নিষ্পন্ন হয়। আর তামসিকতায় আচ্ছন্ন মানুষের জড়তা—দৈহিক বা মানসিক—সকলরকম শক্তির অভাবমাত্র। স্বামীজীর ভাষায়, "ঐ যে মিনমিনে, পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত-চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।...ঐ জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান।"[৩৯]

ভারতের সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয়ে পীড়িত বিবেকানন্দ সাধারণ

মানুষের কাছে ধর্মকে নতুনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মানুষের অন্তর্লীন শক্তিতে বিশ্বাসী স্বামীজী দেশবাসীর শক্তিকে জাগাতে চেয়েছেন ধর্মের মাধ্যমে। সন্ন্যাসীর আদর্শ গৃহীর জন্য নয়। সাধারণ মানুষকে পালন করতে হবে তার স্বধর্ম বা জাতিধর্ম। স্বামীজী বলেছেন, "এই 'জাতিধর্ম' স্বধর্মই সকল দেশের সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান।··· প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে।"[৪০] জাতির প্রগতির মূলসূত্রটি নিহিত আছে এর মধ্যে, স্বামীজী যাকে বলেছেন 'রাক্ষসীর প্রাণপাখী'। তার মধ্যে ইংরেজদের 'এই জাতি ধর্ম ব্যবসাবুদ্ধি, আদানপ্রদান, যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ফরাসীর জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড রাজনৈতিক স্বাধীনতা'। রাজশক্তি যখনই এই জাতিধর্মকে আঘাত করে তখনই দেখা দেয় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ। ভারতবর্ষে ধর্মআচরণের অধিকারবোধ জাতীয় ধর্ম—যখনই সেই অধিকার আহত হয়েছে তখনই এই শান্তিপ্রিয় জাতির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

চতুর্বর্গের অন্যতম হিসাবে 'ধর্ম' আলোচনায় স্বামীজীর ইতিহাসচেতনা, সমাজ-মনস্কতা ও জাতীয়তাবোধ সমন্বিত হয়েছে। আধুনিক যুগ বিজ্ঞাননির্ভর—স্বভাবতই বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদের পটভূমিকায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। জড়বাদী, ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য-জগতে বিবেকানন্দের বক্তব্যের আবেদন সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তাকে তিনি অতিক্রম করেছেন তাঁর আলোচনায় বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত-ভাবে ব্যবহার করে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বিবেকানন্দের চিন্তারই প্রতিধ্বনি করেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, "ধর্ম মানে মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সংগ্রাম—সে সংগ্রামে দেহমনের উৎকর্ষ হয়, যার দ্বারা সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হয়, মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে, নিজের মহত্ত্বকে জানে বা চেনে তাই ধর্ম। বিজ্ঞানও এই অর্থে ধর্ম। দেহের জন্য বিজ্ঞান এবং মনের জন্য ধর্ম। ধর্ম ও বিজ্ঞান একই সত্যের

এপিঠ ওপিঠ। অঙ্গাঙ্গি। ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অসম্ভব।"[৪১] কি বিজ্ঞানে কি ধর্মে অনুশীলন ব্যতীত সত্যের সম্যক উপলব্ধি হয় না। অনুশীলনের মধ্য দিয়েই আসে উচ্চতর ভাবগ্রহণের ক্ষমতা—কি বিজ্ঞানে কি ধর্মে। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষের মনে সাধারণ ভাবে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে একমাত্র বিজ্ঞানই মানুষকে সত্যের প্রত্যক্ষরূপ দেখাতে পারে কিন্তু ধর্মের সত্য উপলব্ধি বা অনুভূতি নির্ভর, প্রত্যক্ষভাবে তা প্রমাণ করা যায় না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনার কথা শুনিয়েছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।[৪২] তিনি তখন ছাত্র হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রাবাসে থাকতেন। ছাত্রাবাসটির অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্বামী নির্বেদানন্দ। সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন স্বামী নির্বেদানন্দের সহপাঠীবন্ধু। একবার এঁদের কয়েকজন এসেছেন আশ্রমে। নানাবিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলছে। স্বামী নির্বেদানন্দ সেসময় 'কালচারাল হেরিটেজ্ অব ইণ্ডিয়া'র অন্তর্গত 'শ্রীরামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড দি স্পিরিচ্যুয়াল রেনেসাঁস' প্রবন্ধটি রচনা করছেন। তারই একটি অধ্যায়ে ছিল বিবেকানন্দের চিন্তা সম্পর্কিত আলোচনা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়। সেই অধ্যায়টি পড়ে ডক্টর মেঘনাদ সাহা মন্তব্য করলেন. "কিন্তু একটা কথা আছে, বিজ্ঞানের সত্য কেউ মানতে না চাইলে এখনই তাকে আমরা ল্যাবরেটারীতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে পারি। তোমরা ধর্ম সম্পর্কে সে পরীক্ষা দিতে পার না।" নির্বেদানন্দ অবিচলিতভাবে জবাব দিলেন, "তোমরাও পার না।" সামনের মাঠে একজন চাষী লাঙ্গল দিচ্ছিল, তার দিকে দেখিয়ে নির্বেদানন্দ বললেন, "একে আজ তোমার ল্যাবরেটারীতে নিয়ে গিয়ে তোমার এ্যাস্ট্রো-ফিজিকেসর লেটেস্ট থিয়োরীটা বুঝিয়ে দিতে পার?" মেঘনাদ সাহা বললেন, "না, তার জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতির।" নির্বেদানন্দ বললেন, "ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই—প্রয়োজন অনেক প্রস্তুতির, অনেক অনুশীলনের, কারণ ধর্ম হচ্ছে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান।"

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ লিখেছেন, "ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা বোধহয়।...সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞানের অর্থ কেবলমাত্র রেডিও টেলিভিসন কিংবা যান্ত্রিক কোনো কারিগরিবিদ্যা যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এনে দিয়েছে কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।...কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সঠিক কি বোঝায় তা জানতে গেলে আমাদের উচিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দিকে তাকানো। তাদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যের সন্ধান; প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য লুকানো রয়েছে, যা সূত্রাকারে প্রতিফলিত হয় ইন্দ্রিয়চেতনার মাধ্যমে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতায় সেই রহস্যের, সেই সত্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান হল অভিজ্ঞতার আন্তরিক নির্ভীক ও বিবিক্ত বিশ্লেষণ যার সাহায্যে বিক্ষিপ্ত সংবেদনগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিয়মিত সূত্রে বাঁধা যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।" রঙ্গনাথানন্দজী কার্ল পিয়ার্সনের 'গ্রামার অব সায়ান্স' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঠনের উল্লেখ করে বলেছেন, "পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ বিশ্লেষণ এই দুটিকে চিন্তায় ও বাক্যে উপস্থাপিত করাই বিজ্ঞান পদ্ধতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোনোও বিষয়ে নিদিধ্যাসনায় যদি এই দুটি উপস্থিত থাকে তবেই তা বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হবে, তা সে বিষয় যাই হোক না কেন। তাহলে বিজ্ঞান বলতে কতকগুলো বিশেষ তথ্যসমষ্টিই বোঝায় না যদিও পদার্থ বিদ্যা রসায়ন, জীববিদ্যা কিংবা সমাজবিদ্যা কতকগুলি বিশেষ তথ্যাবলীর সঙ্গে জড়িত। আরও দেখা যাচ্ছে এই বিভিন্ন বিভাগগুলি যত দিন এগোচ্ছে ক্রমশঃ নিজেদের পরিসর ছাড়িয়ে অন্যক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি একত্রে বিজ্ঞানের সামগ্রিক অনুসন্ধান চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে। এই ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক ধর্মের যে তাৎপর্য ফুটে ওঠে এবং মানুষের অন্তর্জগতের ঘটনাপ্রবাহের যে বিজ্ঞান যা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় তুলে ধরা হয়েছিল এবং আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিলেন তার তাৎপর্য খুবই ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী।"[৪৩]

পৃথিবীর প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ আজ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে

সচেতন। বিজ্ঞান বস্তুজগতের সেই অংশকেই আলোকিত করতে পারে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু সে ইন্দ্রিয়চেতনা এতই গণ্ডিবদ্ধ যে তার বাইরের আর এক জগতের খবর অজানাই থেকে যাচ্ছে। এই দুই জগতের সমন্বয় ভিন্ন মানুষের সত্যান্বেষণ কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। স্বামীজী বলেছেন, "রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়-বস্তু কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেইরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার। রসায়ন-জগতে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতিরাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে ধর্মশিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষি-গণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ কেননা জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিবার জন্য তাঁহারা অন্তররূপ বিপরীত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণও সেইরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ কেননা তাঁহারাও ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানদানে অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।"[৪৪] বহির্জগৎ বিজ্ঞান এবং অন্তর্জগৎ বিজ্ঞান—মানুষের জীবনে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনকাল থেকে মনোজগৎ সম্পর্কে প্রাচীন ঋষিরা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তারই পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত রোমাঁ রোলাঁর একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি : "ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো সাধুসন্তদের আবেশ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা যখন বলা হয়, এইটি ভুললে চলবে না, এদের মধ্যে আর ইউরোপীয় নিকৃষ্ট অধিবিদ্যার মধ্যে কোনোই মিল নেই।...তাঁদের দিব্যের বিজ্ঞান যথার্থই এক পবিত্র উচ্চমার্গের বিজ্ঞান, মনের এক সুদীর্ঘ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে লাভ করা। এটা কতো কাম্য হতো—বিশ্লেষণ করার জন্য, খুঁটিয়ে দেখার জন্য হলেও—যদি ইউরোপীয়রা পশ্চিমের বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে এ নিয়ে পড়াশুনো করতেন! এর সামান্য যেটুকু চোখে পড়েছে, তাই আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে চিন্তার শক্তি এবং বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কী এক সমৃদ্ধিকে!"...[৪৫]

ধর্ম নিজে যেমন বিজ্ঞান, তেমনি আধুনিক জড়বিজ্ঞানের পরিপূরকও। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সামনে নানাবিধ ভোগের উপকরণ সযত্নে

উপস্থিত করেছে। মানুষ আজ তাপনিয়ন্ত্রিত, স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্র-সমন্বিত, বিলাস উপকরণে সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করতে পারে। তার বাইরের চেহারায়, পোশাকে, আচারে কোথাও অশান্তির চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাবে না কিন্তু শান্তির চূড়ান্ত নিশ্চয়তা এর মধ্যে নেই। তা যদি থাকত, যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার কাছ থেকে সব পেয়েও কেন মানুষ অন্তর-জগতে এত নিঃস্ব, রিক্ত ? ভোগবাদের পীঠভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলে-মেয়েরা কেন স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণের পথে এসে দাঁড়িয়েছে ? আজ মানুষ সর্বক্ষণই বাস করছে উত্তেজনা, যন্ত্রণা, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। এর কারণ তার ভারসাম্যরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন সেই অন্ত-র্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। বহির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যখন অন্তর্বিজ্ঞান সম-পরিপুষ্টি লাভ করে তখনই মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা পায় —তার পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা জাগে। একালের এক মনীষী ঐতিহাসিক টয়েনবী শুনিয়েছেন এক সতর্কবাণী : "বিশ্বইতি-হাসের এক যুগান্তরের অধ্যায়ে আমরা আজ বাস করছি কিন্তু এটা আজ সুস্পষ্ট, যে অধ্যায়টির আরম্ভ ছিল ইউরোপীয় তার উপসংহার হবে ভারতীয়, যদি না আমরা আত্মহননের ধ্বংসলীলায় মানবগোষ্ঠিকে নিঃশেষ করে দিতে চাই। বর্তমানযুগে আমরা পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রকৌশলের কল্যাণে জড়বাদের ভিত্তিভূমিতে মিলিত হতে পেরেছি । সেই যান্ত্র নৈপুণ্য আমাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বকেই শুধু ঘুচিয়ে দেয় নি—সেই সঙ্গে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে বিধ্বংসীশক্তি। আমরা পরস্পরের বন্দুকের নলের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসার শিক্ষা আমরা পাই নি। মানবেতিহাসের এই সঙ্কট মুহূর্তে মানবসভ্যতার সম্মুখে একটি পথই মাত্র খোলা আছে—তা হল ভারতীয়তার পথ—সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার পথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের পথ। এখান থেকেই আমরা পেতে পারি সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনা যা বিশ্বমানব সমাজকে একটি পারিবারিক বন্ধনসূত্রে বেঁধে দিতে পারে এবং আণবিক যুগে আত্মহননের বিকল্প এ-ছাড়া আর কোনো পথ নেই।"[৪৬]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একমাত্র আলোকবর্তিকা। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মোপলব্ধির আলম্ব-মন্ত্র এবং সমাজ সেবাব্রতানুষ্ঠানের নান্দীপাঠ।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা

সভ্যতার উন্মেষ, সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত তত্ত্ব আছে। এর মধ্যে পরিণাম বা বিবর্তনবাদ (Theory of evolution) প্রায়-সর্বজনস্বীকৃত। মানুষ আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি—কতকগুলি পশু-স্তর অতিক্রম করে অরণ্যবাসী বর্বর অবস্থায় সে পৌঁছেছে এবং সেই অবস্থা থেকে ক্রমশঃ নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সুসভ্য অবস্থা, সাধারণভাবে মানবসভ্যতার এই ইতিহাসই স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক—বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারায় এই পরিণামবাদ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সহজ কথায় সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"আদিম মানুষ কাঠপাথরের যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মতো কুঁড়ে ঘরে দিন গুজরান করত।···ক্রমে মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে শিখলে··· আদিম মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু-জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষবাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ করতে শিখলে।···চাষবাস আরম্ভ হল। যে ফলমূল শাকসব্জী ধান চাল মানুষ খায় তার বুনো অবস্থা আর একরকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল, বুনো ঘাস, নানারকম সুখাদ্য, বৃহৎ ও উপাদেয় ফলে পরিণত হল। আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে মায়ের উপর ছিল···ক্রমে ধনপত্র পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বললে, 'যেমন এ ধনধান্য আমার, আমি চাষবাস

করে বা লুটতরাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায় তো আমি বিরোধ করব' তেমনি বললে, 'এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে তো বিরোধ হবে'। বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হল। মেয়েমানুষ পুরুষের ঘটি, বাটি, গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হল।"[১] একই ধরনের চাহিদাকে কেন্দ্র করে তৈরী হল গোষ্ঠি, ক্রমশঃ তারই পরিণতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

সম্পত্তি-বোধ থেকেই অধিকার-বোধের উদ্ভব। অধিকারবোধ থেকে ক্রমশঃ সূত্রপাত হয়েছে শোষণ বা **Exploitation**-এর। দেশ ভেদে সমাজ বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। উন্নততর অবস্থায় মানুষ কৃষিনির্ভর। অনুন্নত যাযাবর মানুষ বিভিন্ন উন্নত জনপদ লুটতরাজ করে জীবিকা-নির্বাহ করেছে। শারীরিক শক্তির দিক থেকে কৃষিনির্ভর মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তাদের বুদ্ধিমত্তার কাছে যাযাবর মানুষ ক্রমশঃ পরাজিত হয়ে তাদের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। বিরোধ ও মিলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজ। আজ সমাজবদ্ধ মানুষের ভিতর যেমন মিলনের সূত্র আছে তেমনি আছে সংঘর্ষের বীজ।

মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন শুরু করেছে তখনই তার সুবিধার জন্য তৈরী করে নিয়েছে কতকগুলি নিয়ম। সে নিয়মের প্রণেতারা ছিল স্বভাবতই উন্নতবুদ্ধির মানবগোষ্ঠি—সুতরাং সে নিয়ম সহায়ক হয়েছে প্রধানত তাদের এবং দৈহিক শক্তিতে প্রবলতর প্রতিপক্ষকে তারা কাজে লাগিয়েছে নিজেদের সম্পদবৃদ্ধি করতে। এই শোষণপ্রবৃত্তি সমাজের প্রায় জন্মলগ্ন থেকে। স্বামীজী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এসব মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকল সৃষ্টি হতে লাগল, নানারকম ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেইসব রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলেমিশে সেইসব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার জিনিসটা ও জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে

গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে সে পেল ঘোড়ার ডিম ; যে পাহারা দিলে সে জুলুম করে কতকটা আগভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে সে সবের দাম দিয়ে মলো !! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু'জন কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। যে জিনিস তৈরী করতে লাগল সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগল।"[২]

স্বামীজীর এই সমাজবিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য হলো সূক্ষ্ম ইতিহাসবোধ। ইতিহাসের ধারায় সমাজের চলমান রূপ এবং তার মধ্যে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বামীজীর চিন্তায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত সমাজে শ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা নির্ণয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চেহারা প্রকাশিত এবং তার সমবেদনার সবটুকু অধিকার করেছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়—যাদের পরিশ্রমে ও ঐকান্তিকতায় সভ্যতার অগ্রগতি। 'ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারা'র দল অর্থাৎ পরশ্রমজীবী সম্প্রদায় সামাজিক বৈষম্য এবং সংঘর্ষের কারণরূপে চিহ্নিত। 'যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা' কিছু উন্নতি' যাদের, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য, সেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি স্বামীজী প্রণাম নিবেদন করেছেন। সেই শোষিত ও শাসক সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের রূপ ও পরিণতি সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণাই তাঁর সমাজচিন্তার মূলকাঠামো রচনা করেছে।

বিবেকানন্দের সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করে নিতে পারি (১) বিশ্বসমাজ এবং (২) ভারতীয় সমাজ। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিগত বিষয়গুলি ব্যাপক—বিশ্বসমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবি সেখানে প্রতিভাত। ভারতবর্ষ সেখানে পটভূমি। আর ভারতীয় সমাজ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আলোচনায়, যেমন জাতীয়তা-

বোধ ও সংহতি, নারীর স্থান ও অধিকার, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে চালচিত্র রচনা করেছে বিশ্বসমাজ। এই পটভূমিকায় ভারতীয় সমাজের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। সর্বপ্রথম আমরা স্বামীজীর চিন্তায় বিশ্বসমাজের প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

সমকালীন রাষ্ট্রনীতিতে সামন্ততন্ত্রের যুগ অতিক্রান্ত। কোনো কোনো স্থানে রাজন্যব্যবস্থা অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকলেও প্রধানত গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আগামীকালের শাসনব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্র-চিন্তা গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। তারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্ত্যজগতে ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছে, "সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"

স্বামীজী ব্যক্তিত্বের বিকাশে গভীরভাবে আস্থাশীল এবং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান শর্ত হল স্বাধীনতা। মানুষের দেহ-মনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রথম তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তখন স্বভাবতই তাঁর মনে আশা জেগেছিল আমেরিকাই সামাজিক দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে এবং শূদ্র বা শ্রমজীবী শ্রেণীর দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটাবে কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সে আশা ভেঙে গিয়েছিল। ১৯০০ সালের ৯ জুন তারিখের একটি পত্রে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "আমেরিকা শূদ্র সমস্যার সমাধান করবে, স্বামীজী সে আশা ত্যাগ করেছেন। আমেরিকা একনায়কত্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।"[৩]

নিবেদিতা স্বামীজীর এই মানসিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে Master As I Saw Him" গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁর (স্বামীজীর) ধারণা ছিল মানবতার যে যুগ সমাসন্ন হয়েছে তা প্রধানতঃ শ্রমজীবীর সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত হবে। পাশ্চাত্ত্যে প্রথম পদার্পণকালে সেখানকার অধিকার সাম্য দেখে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন…পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বচ্ছতর দৃষ্টিতে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতা, বিশেষ অধিকারের জন্য কাড়াকাড়ি-লড়াইয়ের চেহারা ধরা পড়েছিল। এক-

জনকে একান্তে বলেছিলেন, পাশ্চাত্যজীবন তাঁর কাছে 'নরকের মত' মনে হচ্ছে। পরিণত অভিজ্ঞতায় তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, অন্য যে-কোনো আধুনিক দেশ (অর্থাৎ আমেরিকা) অপেক্ষা চীন দেশই মানবিক নীতিবোধের আদর্শরূপের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়েছে।"[৪]

আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের চেহারা যতই দর্শনধারী হোক না কেন তার স্বরূপ চিনতে স্বামীজীর ভুল হয় নি। গণতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ মূল ঘোষিত নীতি হলেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রভুত্বই তার লক্ষ্য খুব স্পষ্ট-ভাবেই স্বামীজী সে কথা জানিয়েছিলেন সমকালে উদ্বোধনে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' (১৩০৭-৮) রচনায়: 'ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট, মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ওই এক কথা। শক্তিমান পুরুষেরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকীগুলো ভেড়ার দল।...রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে...। সে ঘুষের ধূম, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্ত্য দেশে হয়। রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।"[৫] এই হতাশার জন্যই ভোগোপযোগী পণ্য উৎপাদনে সাফল্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আপেক্ষিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও মানবসমাজের পক্ষে গণতন্ত্রকে আদর্শনীতি হিসাবে স্বামীজী গ্রহণ করতে পারেন নি।

স্বতই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সাম্যবাদের দিকে যা তখনো পর্যন্ত তত্ত্ব হিসাবেই পরিচিত ছিল এবং সে-তত্ত্ব সমকালীন রাষ্ট্রনায়কদের শিরঃ-পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বামীজী কিন্তু সেই অপ্রচারিত তত্ত্বের মধ্যেই শুনেছিলেন ভাবীযুগের পদধ্বনি, ঘোষণা করেছিলেন, "তথাপি এমন দিন আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রের সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[৬]

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন। কেউ কেউ 'শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের অভ্যুত্থান, কথাটির ভুল ব্যাখ্যা করে স্বামীজীর বিরুদ্ধে কাল্পনিক

অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য’ গ্রন্থে দেখা যায় স্বামীজী সামাজিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে অবসিত দুটি যুগের কথা বলেছেন—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুগ এবং প্রচলিত যুগ হিসাবে বৈশ্যযুগের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের পরবর্তী কাল হিসাবে শূদ্রযুগ অর্থাৎ শ্রমজীবী প্রাধান্যের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। পর্যায়ক্রমে পুরোহিততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পরবর্তী সমাজতন্ত্র। শূদ্র অর্থে শ্রমজীবী—শিল্প বা কৃষি অথবা অন্য যে কোনো দিক থেকেই হতে পারে। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে’ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় যে বাধার কথা উল্লেখিত হয়েছে তা হল পাশ্চাত্ত্যের গুণগত জাতিপ্রথা। অর্থাৎ বৃত্তিসূত্রে জন্মগতভাবে শূদ্র স্বকীয় প্রতিভায় উচ্চশ্রেণীতে গৃহীত হতে পারে—ফলে তার স্বশ্রেণী চিরকালই প্রতিভাবান শূদ্রবিশেষের সহায়তা-বঞ্চিত হয়ে অনুন্নতরূপেই কালযাপন করতে বাধ্য হয়। স্বামীজী বলেছেন সামগ্রিকভাবে শূদ্র বা শ্রমজীবী অভ্যুত্থানের কথা এবং তারই পূর্বাভাস দেখেছেন ‘সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম’ প্রভৃতি তত্ত্বের মধ্যে’।[৭] এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে অন্যত্রও ছড়িয়ে আছে—তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা তিনি বলেছিলেন ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

Sometimes he was in a prophetic mood as on the day when he startted us by saying ‘the next great up-heaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China, I can’t quite see which, but it will be either Russia or China.[৮]

সেদিন বিস্মিত ক্রিস্টিনের কাছে আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিবেকানন্দ। বলেছিলেন, “ইউরোপ আগ্নেয়গিরির পাশে বসে আছে। আধ্যাত্মিকতার প্লাবনে যদি আগুন নিভিয়ে ফেলা না হয় তাহলে অগ্ন্যুৎপাত অবশ্যম্ভাবী।”[৯] ১৮৯৫ সালের কথা—তারপর মাত্র কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যেই তাঁর স্বচ্ছ-ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

শ্রীমতী ক্রিস্টিন এ ঘটনাকে রহস্যময় বলে মনে করেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কোনো ভাবাবেগ-তাড়িত তাৎক্ষণিক ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র নয়। স্বামীজীর ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে বাস্তবদৃষ্টিই এই ভবিষ্যৎ দর্শনের ভিত্তি। এ সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারা যায়। স্বামীজী-অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। সে পত্র থেকে জানতে পারি, ১৯০১ সালে স্বামীজী যখন ঢাকায় মোহিনীবাবুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন হেমচন্দ্র গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং "সত্যদ্রষ্টার নেতৃত্ব ও আশীর্বাদ" লাভের বাসনায়। হেমচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন শ্রীনাথ পাল, যিনি পরে ইন্‌স্‌পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জিকে হত্যা করেন, স্বদেশীযুগের "মাস্টার সাহেব" নামে অভিহিত মৌলভী আলিমুদ্দিন, রডা অস্ত্র মামলার আসামী হরিদাস দত্তের দাদা যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং এমনি বাছাই-করা কয়েকজন। সেদিন স্বামীজীর স্পর্শ ও আশীর্বাদ তাদের মধ্যে কি শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল তা বর্ণনা করেছেন হেমচন্দ্র। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন, "হ্যাঁ, পৃথিবীতে শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই হল এই, এই হল শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখো, চীনের ভবিষ্যৎ মহান অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।"

সেদিন হেমচন্দ্রের কাছেও এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অনধিগম্য, বিশ্বাসের অতীত। স্বভাবতই সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিভাবে তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন?" স্বামীজী উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি আবরণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি।...তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান ঘটবে প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে ঠিক তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।

এ তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথা সন্দেহ নেই কিন্তু সে অন্তর্দৃষ্টি অলৌকিকতা-আশ্রয়ী নয়। এ সত্যদৃষ্টির জন্ম সামাজিক গতিপ্রকৃতির গভীরতর পর্যবেক্ষণ শক্তির মধ্যে; এই কারণেই তিনি বলেছেন, "সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই হল এই"। ক্রিস্টিনের কাছে তিনি বলেছিলেন, রাশিয়া কিংবা চীন, নিঃসংশয় হতে পারেন নি কিন্তু পাঁচবছরের ব্যবধানে তাঁর দৃষ্টি পরিণততর—তাই সুনিশ্চিত সত্যপ্রকাশে দ্বিধাহীন। সমাজে শূদ্রশ্রেণীর আধিপত্য ইতিহাসের অনিবার্য ফল বলেই স্বামীজী বিশ্বাস করেন এবং তাকে আহ্বান জানাতে তিনি সবিশেষ আগ্রহী। ১৮৯৬ সালের ১ নভেম্বর তিনি শ্রীমতী মেরী হেলকে একটি পত্রে লিখেছেন, "প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা (পুরোহিত শাসন, ক্ষত্রিয় শাসন ও বৈশ্য শাসন) শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।" এই পত্রেই স্বামীজী তাঁর রাষ্ট্রনীতির আদর্শ অকপটে প্রকাশ করেছেন, "আমি একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist), তার কারণ এই নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—এই হিসাবে।...অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভালো। জগতে ভালোমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আর-এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।"

স্বামীজীর আদর্শ যে শ্রেণীহীন সমাজ সে কথাটিও তিনি এই পত্রের মধ্যে বলেছেন, "যদি এমন রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" শ্রেণী-

স্বার্থবর্জিত শ্রেণীসমন্বয়ের এই চিন্তার মধ্যে স্বামীজীর রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজে যখনই কোনো বর্ণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই তারা কতকগুলি বিশেষ অধিকারের দাবী আদায় করে নিয়েছে। স্বামীজী এই বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শাণিত করেছেন, "কর্মানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সমাজের স্বভাব। সে ভাব থাকবে কিন্তু চলে যাবে বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি। সামাজিক জীবনে আমি বিশেষ এক ধরনের কাজ করতে পারি, তুমি অন্য ধরনের কাজ করতে পার। তুমি না হয় দেশশাসন কর আমি না হয় জুতো সারি কিন্তু তাই বলে তুমি আমার চেয়ে বড় হতে পার না, আমার মাথায় পা দিতে পার না। কর্ম অনুসারে বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকটি কাজের এবং সেই কাজে নিযুক্ত মানুষের সমান উপযোগিতা আছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেশশাসক এবং জুতানির্মাতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কেননা সামগ্রিকভাবে দেশ বা সমাজের জন্য দুটিরই উপযোগিতা আছে। বর্তমান সমাজকে এই বিশেষ অধিকারের প্রধানত চারটি দাবীদারের দাবী মেটাতে হয়। তারা হল (১) অধিক দৈহিকশক্তির অধিকারী শ্রেণী (২) অধিক বিত্তসম্পন্ন সম্প্রদায় (৩) আপেক্ষিকভাবে বুদ্ধিমান সম্প্রদায় (৪) আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী শ্রেণী। বিবেকানন্দের মতে, "মানুষ পরস্পর পৃথক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্যের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। ...আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। ...কিন্তু অধিকার বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও দেশের সামাজিক জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান—ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকেদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কাড়িয়া লইবে

কি না। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম।...একদল লোক স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিবে—ইহা তো নীতি-সম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধাভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা।"[১০]

রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অর্থনীতির প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। সেই কারণে স্বামীজীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা থেকে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন অর্থনীতির মূল পাঠ "খালি পেটে ধর্ম হয় না" অর্থাৎ আত্মিক বিকাশের মূল শর্ত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা—ক্ষুধা থেকে মুক্তি। সমগ্র ভারত প্রব্রজ্যাকালে তিনি দেখেছিলেন অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত দুর্দশার বীভৎস চেহারা। কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানরত সন্ন্যাসী উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য। আমেরিকায় অবস্থানকালে ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩ হরিদাস মিত্রকে স্বামীজী লিখেছিলেন, "আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রদের জন্য উপায় দেখতে।" ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্যের একটি বড় কারণ বিদেশী শোষণ। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূলসূত্রটিকে সন্ধান করেছেন বিবেকানন্দ। ভারতের আর্থিক অবনতি এবং ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কত জিনিস ভারতে জন্মায়। বিদেশীলোক সেই **Raw materials** দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে নানা জিনিস তয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে হা অন্ন হা অন্ন করে বেড়াচ্ছিস।"[১১] বিবেকানন্দ

দেখিয়েছেন, তৎকালীন অর্থনীতিক ব্যবস্থায় উপনিবেশগুলির শোচনীয় অবস্থা। কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশগুলি শাসকশ্রেণীর স্বার্থে কখনও শিল্পোন্নত হয়ে উঠতে পারে না কারণ উপনিবেশগুলিই শাসকবর্গের প্রধান বাজার।

এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল কি? শাসক দেশগুলি ধনে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে আর যারা তাদের সমৃদ্ধির ভিত্তি সেই সব দেশগুলি কাঁচা-মালের জোগানদার এবং তৈরী মালের ক্রেতা হিসাবে দু'তরফ লোক-সানের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। সমাজ যখন ভারসাম্য তত্ত্বকেন্দ্রিক এবং মার্ক্সীয়তত্ত্ব অস্বীকৃত তখনই বিবেকানন্দের চিন্তায় ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির মূলসূত্রটি আবিষ্কৃত।

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা 'বিবেকানন্দের সমাজ দর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা' প্রবন্ধে স্বামীজীর অর্থনীতির সংক্রান্ত জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অনেকগুলি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। এরিক হ্যামণ্ড তাঁর স্মৃতিচারণায় বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, "Swamiji soon showed that he was equally versed in history and political Economy." ধর্মসভায় খ্যাতি অর্জনের আগেই আমেরিকান সোস্যালসারভিসএসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় আলোচনার বিষয় ছিল 'অর্থের মান হিসাবে দ্বি-ধাতু'। সেদিনের সভার বিবরণীতে 'ডেইলি সারাটোজিয়ান' পত্রিকার মন্তব্য, "At the conclusion of the reading (of papers) Vivekananda the Hindu monk addressed the audience in an intelligent and interesting manner, taking for his subject the use of Silver in India." পরবর্তীকালে শ্রীমতী হেলকে লিখিত একটি পত্রে (১ নভেম্বর ১৮৯৬) এ সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্যের আভাস পেতে পারি, "সোনা অথবা রূপো—কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না (আর বড় একটা কেউ জানেন বলে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে

গরীবরা আরও গরীব আর ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থ বলেছেন, 'আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ।' রূপার দরে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবন সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে।"[১২] স্বামীজীর প্রথম আমেরিকা পদার্পণের তিন বৎসর আগে একচেটিয়া ব্যবসার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণে **Sherman's Anti Trust Bill** পাশ হয়েছে। ১৮৯২-৯৩ সালে আমেরিকায় প্রচণ্ড ব্যবসায়িক মন্দা দেখা দেয়। এই মন্দার কুফল লক্ষ্য করে স্বামীজী ধনতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক সংগঠনের ত্রুটি উল্লেখ করেছিলেন লণ্ডনের একটি বক্তৃতায়। বেদান্তে বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে বলেছিলেন, "ঈশ্বর যতটুকু জানেন শয়তানও ততটুকুই জানে। সে ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী কেবল তাহার পবিত্রতা নাই—এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে। এই একই মাপকাঠি বর্তমান জগতের প্রতি প্রয়োগ কর। পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবী করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও হয় নাই।"[১৩]

অল্প কয়েকটি কথায় তীব্র ব্যঙ্গের অন্তরালে স্বামীজী ধনতান্ত্রিক শোষণের যে অভিনব চিত্র এঁকেছেন তা থেকে তাঁর অর্থনীতিক ধারণার মূলসূত্রটি সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে—"বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমি সর্ব-শক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপজপ, বিদ্যাবুদ্ধি ইহারই প্রসাদে আমি ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র তেজবীর্য ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতি বিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসমূহ দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু সে মধুপান করিবে কে ? আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ

হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।”[১৪]

আধুনিককালে কোনো দেশের বৈষয়িক অবস্থা পরিমাপের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো গড় উপার্জন। মার্কিন দেশে অবস্থান কালে সেখানকার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য স্বভাবতই স্বামীজীকে বিস্মিত করেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরের ক্ষোভও উৎসারিত হয়েছিল ভারতবাসীর অবস্থার তুলনামূলক বিচারে। স্বামীজী বলেছেন যেখানে ভারতবাসীর “গড় আয় মাসিক দুটাকা” মাত্র সেখানে ইউরোপ আমেরিকার উপার্জন ও স্বাচ্ছন্দ্য কিম্বদন্তীর মতো। একটি পত্রে লিখেছেন, “এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা, খাওয়াপরা বাদ। ইংলণ্ডে এক টাকা। একটা কুলি ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চার আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় এক জোড়া মজবুত জুতা। যেমন রোজগার তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজগার করিতে তেমনি খরচ করিতে।”[১৫] “আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মতো টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিসের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, অপর কোনো জাতি যেন কোনোমতে এদেশে ঘেঁসিতে না পারে। সাধারণ কুলি গড়ে প্রতিদিন ৯৷১০ টাকা করিয়া রোজগার করে ও উহা খরচ করিয়া থাকে।”[১৬]

এই বৈষম্যের কারণ ও ভারতের দারিদ্র্যের মূলসূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে স্বামীজী সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ভারতীয় জনগণের অবনতির কারণ দুটি (১) সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণ এবং (২) সামন্ততান্ত্রিক ও সামাজিক অত্যাচার। তাঁর বহু রচনাতেই এই অর্থনৈতিক শোষণের ভয়াবহ রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ইংরেজ বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে।··· বর্তমান সংখ্যার অন্তত পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার

মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে যদি সবকিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে না নেওয়া হয়।"[17] "অনাদিকাল হ'তে উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তূলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হ'তে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মতো কোথাও হতো না।"[18] "ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের বড় জাত।...ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না।"[19]

কৃষি ও শিল্পের এই শোচনীয় পটভূমিকায় স্বামীজী বিশেষ করে ভারতের উন্নতির জন্য গ্রহণ করতে চেয়েছেন শিল্পের প্রসার। অবশ্য বৃহৎশিল্প স্থাপন যে সময় ও অর্থসাপেক্ষ সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তাঁর নির্দেশ "বর্তমানে যে সোজা কাজটুকু করা চলে তা হচ্ছে—ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয় তার জন্য বাজার সৃষ্টি করা। যারা নিজেরা দালাল নয় পরন্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদের দ্বারাই এ কাজ করানো উচিত।"[20] কৃষিনির্ভর ভারতের বৈষয়িক উন্নতি অনেকখানিই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে নিবদ্ধ। আমেরিকায় অবস্থানকালে সেখানে বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষির উন্নতি স্বতঃই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ভারতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন কিন্তু এর বাস্তব অসুবিধাগুলির জন্য শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করেছিলেন। আমেরিকায় বড় বড় জোতে কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম যতখানি উপযোগী, ভারতে, যেখানে জোতের পরিমাণ অনেক ক্ষুদ্র সেখানে এই ব্যবস্থা ততখানি অনুপযোগী। কৃষির উন্নতিতে তাঁর পথনির্দেশ বর্তমানে যুগান্তকারী বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের (ছাত্র কৃষকদের) প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্যটনে

পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।"[২১] তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সর্বত্র কৃষিগবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠা, যার দ্বারা স্থানীয় কৃষকেরা নিয়মিত কৃষিসংক্রান্ত নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে—"চাই প্রথমত এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র এবং সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।"[২২] তাঁর মঠ মিশন গঠনের পরিকল্পনার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বৈষয়িক পরিকল্পনার দিকটি—"প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে একটা করে মঠ তৈরী করতে হবে। সেখানে একজন সুশিক্ষিত সাধু মোহন্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অধীনে কার্যকরী বিজ্ঞান ও শিল্প শেখানোর বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। সেই বিভাগগুলি পরিচালনা করবেন এক একজন বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী।"[২৩]

১৮৯৭ সালের ১লা মে বলরাম বসুর গৃহে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবী কার্যাবলী প্রণয়নে যে আলোচনা সভা হয়েছিল তাতে উপস্থিত হয়ে বিবেকানন্দ মিশনের কার্যপ্রণালী স্থির করেছিলেন, "মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও গ্রামোপজীবিকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যে রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"[২৪] কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকরাই যে স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল সেটা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে লেখা একটি পত্র থেকে, "ভাগলপুরে যে কেন্দ্রস্থাপনের কথা লিখেছ, সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্যে; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভুষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই দু'এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন start (প্রতিষ্ঠা) করবে এবং ওদেরই মধ্য

হতে শিক্ষক বেরোবে।…ঐ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার ও উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।… চাষাভুষো মৃতপ্রায়…চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।"[২৫]

শুধু কৃষক সমাজের সঙ্গে আধুনিকতার পরিচয় ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়—শিল্পায়ন ভিন্ন জাতির সমৃদ্ধি ঘটবে না সে কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। চিকাগো ধর্মসভার আগেই স্বামীজী কোনো কোনো সভায় বক্তা হিসাবে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। 'ডেলি গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় 'থট এ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাবে' বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী "স্বদেশে তাঁহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন, একদল সন্ন্যাসীকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবেন। ইহা দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতি হইবে।"[২৬] ৫ সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকার সংবাদ "তাঁহার (স্বামীজীর) মতে আজিকার ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ভারত নয়। ভারতবর্ষে গিয়া এখন মিশনারী-দের ধর্মপ্রচারের কোনো প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন লোককে কারিগরী ও সামাজিক শিক্ষাদান।"[২৭]

কুটিরশিল্পের চেয়ে বৃহৎশিল্পের প্রতিই স্বামীজীর আগ্রহ অধিকতর। দ্বিতীয়বার আমেরিকা প্রবাসকালে তিনি বিভিন্ন ধরনের শিল্পবিদ্যালয় দর্শন করতেন প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে কারণ ভারতে অনুরূপ স্কুল স্থাপনের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন ছিল তার লক্ষ্য আর সেই সঙ্গে তাদের সহায়তা লাভের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বর্তমান টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরীর পশ্চাতে স্বামীজীর প্রচেষ্টার কথা এবং টাটাকে উক্ত কাজে উৎসাহিত করার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন শঙ্করী-প্রসাদ বসু 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,' ৫ম খণ্ডে।

ভারতে শিল্পায়নের জন্য পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহায্য ও সহায়তা চেয়েছিলেন কিন্তু ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তাদের দ্বারে উপস্থিত হন নি।

বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে পাশ্চাত্ত্য জগত উন্নত হলেও স্বামীজী তাদের দারিদ্র্যের কথা জানতেন এবং জানতেন ভারতবর্ষ কি দিতে পারে, "আমাদের বস্তুজ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে আমরা (বিদ্যুৎ ও অন্যান্য) শক্তিকে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে সমর্থ হই···এ জিনিস কিছুটা পাশ্চাত্ত্যজগত থেকে শিখতেই হবে···ভারতকে ইউরোপের কাছ থেকে বহিঃপ্রকৃতি কিভাবে জয় করতে হয় শিখতেই হবে আর ইউরোপকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে অন্তরপ্রকৃতি জয়ের রহস্য।"[২৮]
অর্থনীতিক উন্নতি একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালে মানবিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়, এ কথা স্বামীজী কখনই ভোলেন নি, "Excess of knowledge and power without holiness makes human beings devil"—তার নিদর্শন তিনি পাশ্চাত্ত্যজগতে যথেষ্টই দেখেছিলেন। ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য-জীবনের হাহাকার ও অভাব ঘোচে নি। কল্যাণাদর্শ-বিচ্যুত অর্থনীতিক উন্নতি সমাজে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি করে যা দারিদ্র্যের চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। তাই স্বামীজী আধ্যাত্মিক আদর্শচ্যুত বৈষয়িক উন্নতি কামনা করেন নি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের সার্বিক স্ফুরণের সুযোগ সঙ্কুচিত হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। স্বামীজী ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে বিশ্বাসী—তাঁর পরিকল্পিত সমাজতন্ত্রে থাকবে সমষ্টির সমানাধিকার—সেই সঙ্গে আত্মিকবিকাশের পূর্ণ সুযোগ। স্বামীজী জানতেন সাম্য-বাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং সে বিরোধের বীজ রয়ে গেছে তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসীদের কর্মে ও আচরণে। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ধর্মের নামে কতকগুলি বাহ্যআচার, অনুষ্ঠান ও সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বঞ্চনা ও শোষণ করে এসেছেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। স্বামীজীর আশঙ্কা, এর ফলে একদিন জন-চেতনা রুদ্ধ আক্রোশে ধর্মকেই বিসর্জন দেবে। তাই ধর্মের প্রকৃত মর্মকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং

আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িক উন্নতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে মানবসমাজকে পূর্ণতররূপে দেখতে চেয়েছেন।

এবার আসি স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির প্রসঙ্গে। ভগিনী ক্রিস্টিন স্বামীজীর ভারতপ্রেম সম্পর্কে বলেছেন, "আমার মনে হয়, আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন তাঁকে আমরা **India** শব্দটি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ভরিয়ে দেওয়া যায়—এ যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাতে ছিল ভালোবাসা, উত্তপ্তবাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উপাসনা, গভীর বেদনা, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা এবং পুনশ্চ ভালবাসা।"[২৯]

ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন জাতীয় বোধের মানুষের কাছে পাঁচটি অক্ষরের যাদুশক্তি সত্যই অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেই যাদুমন্ত্রেই নিবেদিতা ক্রিস্টিন আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতবর্ষের প্রতি। ক্রিস্টিন লিখেছেন, "Ever after, India became the land of heart's desire. Everything concerning her became of interest—became living—her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, scriptures."[৩০] ভারতের মৃত্তিকা যাঁর কাছে স্বর্গ, ভারতবাসী যাঁর প্রাণ, ভারতের সমাজ যাঁর বাল্যের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের কল্যাণে যিনি নিবেদিত-প্রাণ সেই বিবেকানন্দের বাক্যে ভারত-আত্মার রূপ ফুটে ওঠাই তো স্বাভাবিক। নিবেদিতা লিখেছেন, "আমাদের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে অনুরোধ জানান, এমন একটি মন্দির গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আরও একটি বিরাট মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে

বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয় সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে ; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক যাহা কোনো প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে—ইহার বিপরীত দিকে নয়।"৩১

প্রায় সাড়ে তিন বছর বিদেশ বেদান্ত প্রচারের পর ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনের সংস্পর্শে এসে, তাদের কর্মময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করে স্বামীজীর মধ্যে দেশজননীর প্রতি কর্তব্যবোধ তখন প্রবলতর। একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে তখন তিনি সঞ্জীবনীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেছেন। ভারতমাতা তখন তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা। কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টিতে তিনি নিরাকারা নন—ভারতমাতার সাকার রূপেরই পূজারী বিবেকানন্দ "আগামী পঞ্চাশ বর্ষ আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন ; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।...যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।...তোমার স্বদেশবাসীগণই তোমার প্রথম উপাস্য।"৩২

ভারতবর্ষের দুর্দশার অন্যতম কারণ বিদেশী-শাসন, এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। স্বামীজী যখন সমাজের সর্বস্তরের অবনতির কারণ অন্বেষণ করেন তখন এ সত্যকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাবের বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'—(৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে। বাহুল্যবোধে তার বিস্তৃত বিবরণ দেব না কিন্তু দু'একটি ঘটনা ও মন্তব্যের পুনরুক্তি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সেদিন স্বামীজীর সভায় বক্তৃতার রিপোর্ট নিয়েছিলেন শ্রীমতী রাইট। সেই রিপোর্টের একটি অংশে দেখা যায় স্বামীজীর ইংলণ্ডের অতীত ইতিহাস বর্ণনায় জনৈক শ্রোতা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। উত্তরে স্বামীজীর কণ্ঠ মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়েছিল মৃদুকোমল-দৃঢ়তায়। ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত সন্ন্যাসী দ্রুততায় ও মন্থরতায় ওঠা-নামা করছিলেন। সেই শ্রোতাটিকে উদ্দেশ করে সেদিন তিনি বলেছিলেন, "ভয়াবহ শীত, অভাবের তাড়না এবং উত্তরাঞ্চলের কঠোর বিরূপ প্রকৃতি তাদের (ইংলণ্ডবাসীদের) বন্য করেছে।...কোথায় তাদের ধর্ম ? তারা পবিত্র ঈশ্বরের নাম নেয়, দাবি করে যে অপর মানুষকে তারা ভালবাসে।...মানুষের প্রতি ভাল-বাসা কেবল তাদের ঠোঁটে, বুক ভর্তি হয়ে আছে পাপ আর হিংসায়। ...তাদের হাত রক্তে লাল। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার নামবে তাদের উপরে।...তোমরা খ্রীষ্টান—তোমাদের সংখ্যা কত ? পৃথিবীর জন-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি নও।...চেয়ে দেখ চীনাদের দিকে—কোটি কোটি তারা। তারাই ঈশ্বরের প্রতিহিংসার মতো তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।...ভারতের দিকে চেয়ে দেখো—হিন্দুরা কি রেখে গেছে ? সর্বত্র অপূর্ব মন্দির। মুসলমানেরা কি রেখে গেছে ? সুন্দর সব প্রাসাদ। আর ইংরেজরা ? মণ মণ ভাঙা ব্র্যাণ্ডির বোতল ছাড়া আর কিছু নয়। ...মানুষ যদি ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করে, ইতিহাসের প্রতিশোধকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের উপরে সেই প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা—আর আমাদের জনগণ সারা দেশ জুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে।"[৩৩]

৩০ অক্টোবর ১৮৯৯ শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা চিঠিটিও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে চিঠিতে যেন অন্য এক বিবেকানন্দ আত্মপ্রকাশ করেছেন, ভারতবর্ষে "শিক্ষাবিস্তারও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই), যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল,

অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি আরও কি আসে! কয়েক-ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।...ব্রিটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে।"[৩৪]

ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি স্বামীজী পছন্দ করতে পারেন নি। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে তিনি তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন, "এভাবে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা যায় না। বণিকের বিত্ত বৈভবের জগতে ভিক্ষাপাত্রের কোনো স্থান নেই।...আমাদের সত্তা আজ তমোগুণে আচ্ছন্ন। তা না হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী কী করে বিদেশীরা এসে আমাদের দেশ ও জাতিকে পদদলিত করে যাচ্ছে। হায়! এ দেশ আর পুণ্যভূমি নয়! এ দেশ পদাহতের দেশ, ছুঁৎমার্গীর দেশ, জো-হুকুমের দাসভূমি।"[৩৫]

এই দাসসুলভ মনোবৃত্তিকে স্বামীজী বার বার ধিক্কার দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের সর্বপ্রথম যে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা হল "সচেতনভাবে রজোগুণবৃদ্ধির চেষ্টা।" বাংলার তরুণ দলকে আহ্বান করেছিলেন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হতে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে একবার বলেছিলেন, "ভারতের লোক-গুলো কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলি লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের ইণ্ডিপেনডেণ্ট বলে ডিক্লেয়ার করুক, হেঁকে বলুক 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম' আর সমস্ত গভর্নমেণ্টকে নিজেদের ডিক্লারেশন পাঠিয়ে দিক।—কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হয়।"[৩৬]

বহু ধর্মনীতি, বহু সংস্কৃতি, বিচিত্র জীবনচর্যার দেশ ভারতবর্ষ। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন বিবেকানন্দ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-

বাদের আত্মপ্রসাদ, ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে, একটি শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁরাই ঐক্য সূত্রে বেঁধেছেন ভারতকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যদি কোনো গৌরবের দিক থাকে তা হল তাদের অপশাসন, যার প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ভারতে একজাতিবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং সে বোধও বার বার আহত হয়েছে শাসক-শ্রেণীর কৌশলে। সেই কূট কৌশলের চরম নিদর্শনই বর্তমান ভারত বিভাগ। সাধারণ বিপদ ও সাধারণ স্বার্থ ভারতকে বেঁধেছিল ঐক্যসূত্রে কিন্তু সে ঐক্য ছিল সাময়িক, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যখন আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠছে। স্বামীজী সেই ভাবী বিপদের ছায়া দেখেছিলেন তখনই যখন এটা কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি কিন্তু ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতিভিত্তিক আঞ্চলিকতার লক্ষণ কিছু কিছু অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে এবং তার সমাধানসূত্র নিরূপণে তাঁর চিন্তার পরিচয় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

স্বামীজীর কাছে জাতীয় ঐক্যের প্রধান শর্ত নিজেদের ঐক্যস্বরূপে চিন্তা করা। ঐক্যের ভিত্তি মানুষের মন—বাইরের জগত নয়। মনকে এক করার উপায় দুটি—একটি হলো অখণ্ড ভারত চেতনা। নিবেদিতা লিখেছেন "বিবেকানন্দের ধারণায় ভারত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। তলিয়ে দেখলে, সে ঐক্য যতখানি মনোলোকে ততখানি হৃদয়গভীরে।"[৩৭] শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মমতের মধ্যে যে ঐক্যভিত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন তারই সাধনফল উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন বিবেকানন্দ। সেই উদার দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শুধু শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিই নয় জৈন ও বৌদ্ধ বৃহৎ হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যেই অবস্থিত। স্বামীজীর কথায় "বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই বিরোধী সন্তান।" তিনি দেখেছেন, "পশ্চিম ভারতের জৈনদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আপনারা হিন্দু কি না, তাঁরা উত্তেজিত হয়ে 'ওঠেন।"[৩৮] কিন্তু হিন্দুধর্মের পরিধিবিস্তার সত্ত্বেও মুসলমান, খ্রীষ্টান অধ্যুষিত ভারতভূমিতে অখণ্ড

বোধ জাগে না এবং সেই অখণ্ড চেতনা না জাগলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ভিতর পারস্পরিক বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেইখানেই আসে দ্বিতীয় উপায়টির প্রশ্ন। এক সর্বজনীন ধর্ম বা বেদান্ত ধর্মই সে সমস্যার সমাধান করতে পারে। বেদান্তের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান একই লক্ষ্যের বিভিন্ন পথের যাত্রী। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একত্ব উপলব্ধির মধ্যেই জেগে উঠতে পারে জাতীয়তা এমন কি আন্তর্জাতিকতা বোধও। ভারতের যা কিছু গৌরবময়, তার স্রষ্টা হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক সকলের কাছেই বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাবনত। তাঁর চেতনায় অশোক ও বাবর আকবর ও প্রতাপসিংহের সহাবস্থান। নিবেদিতা লিখেছেন, "···কথোপ-কথন কালে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখগণের বিশ্বাস, মরাঠাদের শৌর্য, সাধুগণের ঈশ্বরভক্তি, মহীয়সী নারীগণের পবিত্রতা—সকলই যেন পুনর্জীবিত হয়ে উঠত।···হুমায়ুন, শেরশাহ, সাজাহান—এঁরা এবং আরও বহুশত মানুষের উজ্জ্বল নাম তাঁর স্মৃত ও কথিত নামমালার অন্তর্ভুক্ত হতো। এই হয়তো তিনি আকবরের রাজ্যাভিষেকের বিষয়ে তানসেন রচিত গান, যে গান আজও দিল্লীর পথে ঘাটে শোনা যায়, তা তানসেনেরই সুরে ছন্দে গেয়ে শোনালেন, আবার হয়তো ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন মোগলকুলে বিবাহিত নারীরা বিধবা হলে পুনর্বিবাহ না করে হিন্দু নারীর মতোই পরবর্তী নিঃসঙ্গ বৎসরগুলি পূজাপাঠে নিমগ্ন থেকে কাটিয়ে দিতেন।···অন্য সময় সেই মহতী প্রতিভা আকবরের কথা বলতেন···আর এক সময়ে হয়তো নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাঁর বর্ণনামতো আমরা চলে গেছি সেই ভাগ্যাহত নবাব সিরাজদ্দৌলার উজ্জ্বল অথচ ক্ষণস্থায়ী কালে।···সিরাজের সাধ্বী পত্নী বৈধব্যের শুভ্রবাস পরিধান করে নিজের আত্মীয়দের মধ্যে কিভাবে দিন কাটিয়েছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘ বৎসরগুলিতে প্রতিদিন তিনি মৃত স্বামীর কবরের উপর প্রদীপ জ্বালাতেন—সে দৃশ্যও আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত।"[৩৯]

১৯০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি প্যাসাডেনা সেক্সপীয়র সমিতিতে স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ'। "জ্ঞানালোকের মহান-বার্তাবহগণের" পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ,

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদের জীবনী ও বাণী। ব্যাখ্যার উপসংহারে স্বামীজীর উক্তি, "আমরা তাঁহাদিগকে প্রণাম করি, আমরা তাঁহাদের দাস।" হজরত মহম্মদ সম্পর্কে স্বামীজী সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন, "মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।...প্রত্যেক মহান আচার্যের জীবনই তাঁহার বাণীর একমাত্র ভাষ্য।...মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃ-ভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গ-ভেদ কিছুই থাকিবে না।...যদি তোমাদের একজন মিশনারী হঠাৎ কোনো গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিবে। আমাদের এত উচ্চ দর্শনশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময়, আচরণের সময় আমরা কিরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।"[৪০]

শঙ্করীপ্রসাদ বসু একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ দিয়েছেন তাঁর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থে। স্বামীজীর তিরোভাবের পর ১৯.৭.০২ তারিখে টাউন হলের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এক মুসলমান যুবক—আবদুল সাত্তার। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যে যদি মতভেদ বা সংঘাত ঘটে তা হবে সমগ্র জাতির পক্ষে আত্মঘাতী।...স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ফলে উভয় সম্প্রদায়কে যে সব স্বর্ণশৃঙ্খল বেঁধে রেখেছে তাদের একটি ছিন্ন হয়ে গেল।"

হিন্দুমুসলমান ঐক্য সাধনায় স্বামীজীর একটি চিন্তা অবিস্মরণীয়।[৪১] মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখেছিলেন, "আমার দৃঢ় ধারণা—বেদান্ত মত যত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন কর্মপরিণত (আদর্শযুক্ত) ইসলামের সহায়তা ভিন্ন তাহা বিশাল জন-সমষ্টির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা মানবজাতিকে সেইস্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই,

কোরাণও নাই অথচ সে কাজ করিতে হইবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণকে সমন্বিত করিয়াই।...

"আমাদের নিজ মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বেদান্ত মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি—এ বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ লইয়া মহামহিমায় অপরাজিত শক্তি হইয়া জাগিয়া উঠিতেছে।"[৪২]

১৮৯৭ সালে এক সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের পটভূমিকায় লাহোরে স্বামীজীকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে শুনি। সেই সময় হিন্দু ও শিখ-ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল—যা আজ ভারতের বুকে মর্মান্তিক হানাহানির ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত। সেই সময় 'নিও খালসা পার্টি'-র নামে কিছু শিখ যুবক শিখসম্প্রদায় যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নয়, এই বিষয়ে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। অবশ্য এর পশ্চাতে সমকালীন শাসক সম্প্রদায়ের কিছু পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এবং ক্রমশঃ কিছু উত্তাপও সৃষ্টি হয়েছিল। লাহোর বক্তৃতায় স্বামীজী বিশেষ করে এই বিভেদনীতি সম্পর্কে শিখসম্প্রদায়কে তার অতীত মহাত্মাদের শিক্ষার দিকে সচেতন করে তোলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এই খানেই অপেক্ষা-কৃত আধুনিক কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন।...সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে...আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।... আমি পূর্বদেশ হইতে পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে আসিয়াছি...আমাদের মধ্যে কোনো বিভিন্নতা আছে কিনা তাহা বাহির করিবার জন্য নহে—আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে, কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল আমাদের আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি, তোমাদের কাছে

কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।... বর্তমান যুগের বাণী আমাদের কাছে আসিয়া বলিতেছে, যথেষ্ট সমালোচনা, যথেষ্ট দোষ দর্শন হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আগাইয়া দিতে হইবে।"[৪৩]

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।"[৪৪] তিনি বলেন, ধর্মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভেদ থাকলেও তত্ত্বগুলি মূলত এক। ভারতে বেদকে ধর্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে— ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্ত ভেদের শেষ মীমাংসাকারী বেদ—সুতরাং সকলপ্রকার বিভেদ সত্ত্বেও আমাদের মিলনভূমি বেদ। ঈশ্বরের যেভাব যে সম্প্রদায় প্রচার করুক না কেন সকলেই যে, সগুণ হোক নির্গুণ হোক, ঈশ্বরেই বিশ্বাসী এবং নিজ নিজ মতের সমর্থনে বেদকেই প্রামাণ্য হিসাবে উপস্থিত করেন একথা অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের যে সাধারণ মিলনভিত্তি রয়েছে তাকে অবলম্বন করেই সাধারণ জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারে।

গুরু নানক স্বামীজীর অনেক গভীর আধ্যাত্মিক মুহূর্তের সঙ্গী। গুরু নানকের পাঞ্জাবী ভাষায় গান তাঁর মুখে অনেকেই শুনেছেন—আর শিষ্য-শিষ্যারা শুনেছেন নানকের বিবিধ কাহিনী। গুরুগোবিন্দের শৌর্যে স্বামীজীর মুগ্ধ-চিত্ত তাঁর কাহিনী বর্ণনায় উচ্ছল হয়ে উঠত। স্বামীজীর কাছে তিনি ছিলেন হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ইদানীং আরও একটি সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। স্বামীজীর কালে সেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রেষারেষির উদ্ভব মাত্র হয়েছে কিন্তু তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তখনই

তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন। সেই বিরোধের পটভূমিকায় স্বামীজী লিখেছেন 'Aryans & Tamilians'—'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধটি। বিবেকানন্দ 'আর্য' শব্দটি গ্রহণ করেছেন সংস্কৃতিবাচক হিসাবে—যার অর্থ, শিষ্ট বা সভ্য। স্বামীজীর মতে "আর্য জাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত।" আর্য ও দ্রাবিড় এই বিভাগ ভাষা-তাত্ত্বিক বিভাগমাত্র—করোটিতত্ত্বগত নয়···ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নামগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ। উহারা কেবল একটি গোষ্ঠির মর্যাদাসূচক, এই গোষ্ঠিও সর্বদা পরিবর্তনশীল।···যে বর্ণের হাতে তরবারি রহিয়াছে সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ; ধনসম্পদ যাহাদের হাতে তাহারাই বৈশ্য।"[৪৪]

জাতির এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের পথে কতবড় অন্তরায় তা অনুভব করেই সেদিন বিবেকানন্দ উচ্চারণ করে-ছিলেন সতর্কবাণী: "বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হইবে না। যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতি কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে।"[৪৫]

প্রবন্ধের শেষ অংশে তাঁর উদাত্ত ঘোষণা: "আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী —আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্ব-পুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত···জড় অথবা চেতন এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, এজন্য আমরা গর্বিত— আবার কর্মাবসানে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মায়াতীত জগতে প্রবেশ করি, এজন্য আমরা আরও বেশি গর্ব অনুভব করি।"[৪৬]

স্বামীজীর সমাজচিন্তার বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ণাশ্রমধর্ম সমস্যা। বর্ণা-শ্রম ধর্মের প্রবর্তনের পশ্চাতে যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই থাক না

কেন তার বিকৃত চেহারা সামাজিক অবিচারে ও শোষণের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। ভারতীয় সমাজের অনৈক্যের বীজটি এইখানেই রোপিত। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজবিন্যাসের সঙ্গে ভারতীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে জাতিভেদ প্রথা ব্যক্তিবিশেষকে একক বা Unit হিসাবে গ্রহণ করে। বিত্ত, মেধা, সৌন্দর্য যে কোনো একটি গুণের অধিকারী হলেই ব্যক্তিবিশেষ জন্মগত জাতি ত্যাগ করে উচ্চতর সমাজে যে কোনো পর্যায়ে উন্নীত হবার সুযোগ পায় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রদায়কেই একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানেও নিম্নবর্ণের কোনো ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবার সুযোগ ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত সম্প্রদায়টিকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল।

আর্যতামিল প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজবিন্যাসের প্রাচীন আদর্শ বিশ্লেষণ করে স্বামীজী লিখছিলেন, "ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের এই জগৎসৃষ্টি—মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের এই আদর্শকে ভুলিয়া না যান।"[৪৭] স্বামীজীর এই অভিমত বিশ্লেষণ করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "এখানে স্বামীজী মহাভারতের শান্তিপর্বে ভৃগুর উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে আদিতে সমস্ত বর্ণই ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু জীবিকা ও চরিত্রের পরিবর্তনের ফলে তাঁরা বিভিন্ন বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন।...সমস্ত বর্ণই দ্বিজ।...বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে রাজা ভর্গভূমি ত্রেতাযুগে বর্ণপ্রথা প্রবর্তন করেন। এখানে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, স্বামীজীর উক্তিতে শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন ভারতীয় সমাজ গঠনের ভাব। আদর্শই ফুটে উঠেছে।"[৪৮]

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী জাতিভেদ প্রথার স্বরূপ এঁকেছেন কয়েকটি রেখার টানে: "যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ'

বলিয়া অভিহিত তাহাদের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান' ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি ?"[৪৯] "আত্মবৎ সর্বভূতেষু কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে নাকি ? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে ! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে ?"[৫০] দক্ষিণভারতে এই জাতিভেদ প্রথা স্বামীজীকে কতখানি বিচলিত করেছিল তা তাঁর রচনাবলী পাঠেই বোঝা যায়। "মালাবারে··· রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন ; গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্য চুষ্য খানা, আবার নগদ। ···ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান ; কেন না ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। এক শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ-বদমাশ দেশটা উৎসন্নে দিয়েছে।"[৫১]

ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি উচ্চবর্ণের অত্যাচার বর্ণনায় স্বামীজীর লেখনী তরবারির মতো ধারালো হয়ে উঠেছে। তার কারণ স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পুঁথির পাতার জ্ঞানের আবেদন মস্তিষ্ক পর্যন্ত কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন সমগ্র চেতনাকে আঘাত করে তখন হৃদয়তন্ত্রী তীব্র-ভাবে বেজে ওঠে। স্বামীজী ভারতবর্ষকে দেখেছেন অচ্ছ্যুতের কুটিরে, অভুক্তের হাহাকারে। সেই নির্মম সত্যের আঘাতে হৃদয়ের রক্ত-মোক্ষণে রঞ্জিত তাঁর বক্তব্য, "যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশ বিশ লাখ সাধু ও ক্রোরদশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায় এবং তাদের উন্নতির কোনো চেষ্টা করে না সে কি দেশ না নরক ! সে ধর্ম না পিশাচ নৃত্য !"[৫২]

ভারতে ব্রাহ্মণদের এই অত্যাচারের ফল ব্যাপক ধর্মান্তর। ক্রিশ্চান মিশনারীরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। "পাদ্রীরা···লাখ লাখ নীচজাতকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার

সবচেয়ে যেখানে বেশী সেই ত্রিবাঙ্কুরে যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী এবং স্ত্রীলোকেরা এমনকি রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।"[৫৩] আর অন্য দিকে এতবড় সমস্যার সম্মুখীন উচ্চকোটির মানুষের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নি। এই পটভূমিকায় স্বামীজী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে উচ্চারণ করেছেন সর্তকবাণী, "ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব—ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর, তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয়—শুধু সেবাভাবের দ্বারা। যে ভালভাবে সেবা করিতে জানে, সেই ভালভাবে শাসন করিতে পারে।"[৫৪]

শুধুমাত্র বেদনার ইতিহাস ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করে স্বামীজী ক্ষান্ত হন নি। তিনি চেয়েছেন তাদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিতে—তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত করতে। তিনি নবীন ভারতকে আহ্বান করেছেন যারা আত্মপ্রকাশ করবে "চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচিমেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে—ঝোপজঙ্গল পাহাড় পর্বত ভেদ করে।" কিন্তু সেই নবীন ভারতের উদ্বোধন কেমন করে হতে পারে যখন "কুটিরবাসী সেই সত্যকার জাতি" দীর্ঘকাল অত্যাচার ও বঞ্চনায় পিষ্ট হতে-হতে অন্যের পদতলে নিষ্পেষিত হওয়াকেই তাদের বিধিলিপি বলে গ্রহণ করেছে। সেই বিনষ্ট অধিকারবোধকে ফিরিয়ে দিতেই স্বামীজীর গণশিক্ষার পরিকল্পনা। সেই গণশিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং আধুনিক ব্যবহারিক বিদ্যার দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। স্বামীজী তাঁর ইতিহাস-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে বুঝেছেন নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যখন থেকে বিদ্যা ও শক্তি প্রবেশ করেছে তখন থেকেই ইউরোপের উন্নতি শুরু হয়েছে। ভারতে বংশানু-

ক্রমিক ভাবসংক্রমণের (হেরিডিটি) দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ ও ধনিক শ্রেণী কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছে। সে তত্ত্বকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষের শিক্ষার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্বলকে আগে সাহায্য কর; কারণ দুর্বলকে সাহায্য করাই প্রথম আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তবে সে কোনোরূপ সাহায্য ছাড়াই শিক্ষালাভ করিবে।"[৫৫]

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামীজীর কিছুমাত্র আস্থা নেই। মাদ্রাজে একটি সভায় যুবকদের আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা এখন যে শিক্ষা পাইতেছ···ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈয়ারী হয় না। ···মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না— অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি জিনিস জানা মাত্র বোঝায় তবে লাইব্রেরীগুলি তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অভিধানসমূহই তো মহর্ষি।"[৫৬]

"শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" "যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন হয়, তাই যথার্থ শিক্ষা।"

বিরাট ভারতবর্ষের ব্যাপক অশিক্ষার অন্ধকার কেমন করে ঘুচতে পারে! শহরে যে তথাকথিত শিক্ষার কিছু সুযোগ আছে, স্বামীজী সেখানকার জন্য বিশেষ চিন্তিত নন, প্রয়োজন দরিদ্র মানুষের শিক্ষার, যাদের কাছে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। আমেরিকায় অবস্থানকালে গুরভাইদের কাছে জনশিক্ষা প্রচারের কথা লিখেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এর পূর্বে সমগ্র ভারত প্রব্রজ্যাকালে তিনি ভারতের অশিক্ষার সামগ্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন—আমেরিকায় সেই চিত্রই তাঁকে বারবার উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং তারই ফলশ্রুতি জনশিক্ষা পরিকল্পনা।

১৮৯৪ সালের ৪ঠা মে আলসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছেন, "তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রদের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ এবং কতক গুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত এমন কি চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর, প্রথম তাহাদের ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।...কার্যের সামান্য আরম্ভ বলিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে।"[৫৭]

এর আগেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন এই পরিকল্পনার কথা এবং সেখানে সন্ন্যাসীদের ওপর ন্যস্ত করেছেন এই অজ্ঞতাদূরীকরণের কাজের ভার, "কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে যদি ঘুরে বেড়ায়, নানা উপায়ে কথা map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায় তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।...ফলকথা **If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain**... এ করতে গেলে প্রথম লোক চাই, দ্বিতীয় পয়সা চাই...তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব **and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.**"[৫৮]

কয়েকমাস পরেই আবার রামকৃষ্ণানন্দকে এই শিক্ষাবিস্তারের কথা লিখেছেন—অন্ততপক্ষে বরানগর মঠের কাছাকাছি জায়গাগুলোতেও কাজ শুরু করতে, "কতকগুলো গরীবগুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের **Astronomy, Geography** প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর...সন্ধ্যার পর দিনদুপুরে—কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে—তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও—তারপর ধীরে ধীরে

centre extend কর।"[৫৯]

জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য স্বামীজী যে ব্যাপক জনশিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন তার সমগ্র দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন সন্ন্যাসীদের উপর এবং সে কাজকে তিনি ধর্মাচরণের অঙ্গরূপে চিহ্নিত করেছেন. "এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে সন্ন্যাসিগণ কিসের জন্য এ জাতীয় ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর হইবে ? উত্তরে আমি বলিব ধর্মের প্রেরণায়। প্রত্যেক নূতন তরঙ্গেরই একটি নূতন কেন্দ্র প্রয়োজন গোঁড়া মতবাদ সব গোল্লায় যাউক—উহাদের দ্বারা কোনো কাজই হয় না। একটি খাঁটি চরিত্র, একটি সত্যিকার জীবন একটি শক্তির কেন্দ্র—একজন দেবমানবই এই পথ দেখাইবেন। এই কেন্দ্রেই বিভিন্ন উপাদান একত্র হইবে এবং প্রচণ্ড তরঙ্গের মতো সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সমস্ত অপবিত্রতা মুছিয়া দিবে।"[৬০]

জনশিক্ষাকে কেন্দ্র করে গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে স্বামীজী দুটি কথা বলেছেন যা' তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে এবং আধুনিক বিপ্লব তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা দূর করে। প্রথম কথা গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিকেরা নীরবতা পালন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেখা যায় জনগণের কল্যাণমূলক বিপ্লবাত্মক কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তাঁদের শ্রেণীস্বার্থবোধ লুপ্ত হবে কোন্ যাদুবলে ? এ ক্ষেত্রে স্বামীজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ, "প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর ; বিধান আপনাআপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে—যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে তাহা সৃষ্টি কর।··· যে নূতন শক্তিতে -যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায় ? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর।"[৬১] দ্বিতীয় কথা এই লোকশক্তি গঠনের ভার দিয়েছেন কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীর উপর নয়—শ্রেণী-স্বার্থহীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর—তাদের ধর্মাচরণের অঙ্গরূপে।

ভারতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য অবহেলিত, দরিদ্র সাধারণ মানুষের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নারীজাতির সার্বিক উন্নতির। পাশ্চাত্ত্যে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও চিন্তাধারার নতুন তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। "মাতৃ জাতির অভ্যুদয় ব্যতিরেকে জগতের কল্যাণ সম্ভবপর নহে, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান হয় না। সেইজন্য রামকৃষ্ণ অবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই স্বীয়সহধর্মিণীর শিক্ষা-দীক্ষার ভারগ্রহণ, সেইজন্যই মাতৃভাবপ্রচার।"[৬২] পাশ্চাত্ত্য নারীর মধ্যে তিনি দেখেছেন "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।" বলেছেন, "এইরকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ হাজার আমার দেশে তৈরী করে মরতে পারি তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।"[৬৩]

স্বামীজীর মতে আর্যদের মধ্যে নারীর সম্মান ও মর্যাদা ছিল পুরুষেরই মতো। তাদের ধর্মকার্যে সহধর্মিণীর স্থান ছিল নির্দিষ্ট কিন্তু আধুনিক পৌরাণিক ভাববহুল হিন্দু ধর্মানুশাসন রচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীকালে। এর ফলেই দেখা দিয়েছে অধিকার বৈষম্য। অবশ্য পরবর্তীকালের ঘটনাবিপর্যয়ও নারী অধিকার সঙ্কুচিত করে তাকে অন্তঃপুরবর্তিনী করার কারণ। কালক্রমে কঠোরতর অনুশাসনের ফলে নারীজাতি "ঘৃণ্য কীট, নরকমার্গ" রূপে চিত্রিত হয়েছে। হরিপদ মিত্রকে একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন, "বাবাজী শাক্ত শব্দের মানে জানো? শাক্ত মানে মদভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে...আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[৬৪]

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নারীত্বের আদর্শ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। পাশ্চাত্ত্যে নারীর পূজা জায়ারূপে—ভারতে জননীরূপে। ভারতীয় নারীত্বের সেই স্বকীয়তা ও সৌন্দর্যে—বিবেকানন্দ তৃপ্ত "একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা

জননী" রূপে। তার দুঃখ "এমন সব আধার পেয়ে তোরা এদের উন্নতি করতে পারলি নি।"[৬৫]

নারীজাতির উন্নতি পরিকল্পনায় স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে সমন্বিত করতে। পাশ্চাত্ত্য নারীর আদর্শ আনবে সামাজিক মুক্তি; শিক্ষা ও কর্মশক্তিতে স্ব-নির্ভর হবে নারীসমাজ, আবার অন্যদিকে ভারতীয় মাতৃআদর্শ লালন ও ধারণ করবে সমাজকে। শিক্ষিত নারীব্যক্তিত্ব আদর্শ-সন্তানের জননী হবে। এর জন্য প্রয়োজন নারীর শিক্ষার—যার জন্য তিনি পাশ্চাত্ত্য সমাজ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন—নিবেদিতাকে, ক্রিস্টিনকে। নিবেদিতাকে স্বামীজী লিখেছিলেন, "ভারতের জন্য বিশেষত ভারতের নারী-সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাদের ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, তোমার ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে কেলটিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন।"[৬৬]

স্বামীজীর কাছে শিক্ষা বা শিক্ষকের আদর্শ কি তা আমরা আগেই জেনেছি। নারীজাতির শিক্ষা ও তার ভবিষ্যৎ আদর্শ নিরূপণেও তিনি একই চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, "এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে, তারপর পুরুষই হউক অথবা নারীই হউক —নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।"[৬৭] নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা : "কতকগুলি···ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব।···ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি Centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের

সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে।"[৬৮]

নারীর ভালমন্দ বিচারে পুরুষের কর্তৃত্ব স্বামীজী অনুমোদন করেন নি, তাঁর মতে, "আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রীপুরুষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, সব বুঝতে পারবে।"[৬৯] সুতরাং সমকালীন সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তিনি আদৌ আগ্রহী নন। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিয়ে আইন ইত্যাদির দ্বারা সমাজ সংস্কারের চেয়ে তিনি সমাজের আমূল পরিবর্তন-কেই স্বাগত জানিয়েছেন। স্পষ্টই বলেছেন, "বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই" কারণ মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষের দায়িত্ব তাদের শিক্ষিত করে তোলা পর্যন্ত। "নারীদিগের এমন যোগ্যতা দান করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।"[৭০] অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি বাল্যবিবাহকে কোনোদিনই সমর্থন করেন নি। বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা স্বাস্থ্য হারায়। তাদের সন্তানেরা ক্ষীণজীবী হয়ে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। স্বামীজী বাঙালী সমাজে বিধবার সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ হিসাবে বাল্যবিবাহকে দোষী নির্দেশ করেছেন। সমসাময়িক কালে দাম্পত্যজীবন যাপন সম্পর্কিত Consent bill (সম্মতিজ্ঞাপক আইন) পাশ হয়ে দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে—রক্ষণশীল হিন্দুরা এ আইনের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সেই ঘটনা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন, "সমাজের নেতারা লাখো লাখো লোক জড়ো করে চেঁচাতে লাগলো 'আমরা আইন চাই না'। অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচানো দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে!"[৭১]

উপসংহারে ফিরে যাই বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার মূলভিত্তিতে। একালের সমাজতন্ত্রীরা সাম্যবাদের ব্যাখ্যায় জড়বাদকেই আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন, স্বামীজীর সাম্যবাদ জড়বাদ-উত্তীর্ণ, অধ্যাত্ম-নির্ভর। মানুষের সমানাধিকার মেনে নেবার কারণ কি? বস্তুবাদীরা উত্তরে বলবেন, সব মানুষই সমান তাই সকলের জন্য চাই সমানাধিকার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোথায় মানুষ সমান?—প্রকৃতির মধ্যে আছে বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য! সুতরাং 'সব মানুষ সমান কেন?' এর গ্রহণযোগ্য উত্তর জড়বাদের দিক দিয়ে উপস্থিত করা কঠিন। এর উত্তর দিতে পারে বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদ -তাঁর বৈদান্তিক চিন্তা। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার আত্মার উপলব্ধিতে—জড় দেহে নয়। অধ্যাত্মবাদের মধ্য দিয়েই মানুষের স্বরূপ উপলব্ধ হতে পারে। বিবেকানন্দ মনে করেন, ধর্ম বোধের মধ্যেই মানুষ যথার্থ সাম্যবাদী হতে পারে। মানুষ পরমাত্মার অংশ—সুতরাং স্বরূপে কোনো ভেদাভেদ নেই। এই পরমাত্মা কিংবা পরমাল্লা অথবা পরম-ঈশের অংশরূপেই সে সমান। সুতরাং ঈশ্বরের এক সন্তান যদি অন্য সন্তানকে ঈশ্বরের সন্তান বলে জানতে পারে তাহলে তার অধিকারকেও স্বীকার করে নিতে হবে তারই সন্তান হিসাবে। বেদান্তের মহান আদর্শই এই সমদর্শিতা আনতে পারে।

স্বামীজীর সমাজ ও ধর্মচিন্তার মূল একটিই মানুষ—"মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি রহিয়াছে তাহার বিকাশই ধর্ম। অনন্ত শক্তির উৎস কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে রহিয়াছে এবং সেই উৎস ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। যতই প্রসারিত হয়, ততই ইহা দেহের পর দেহ ধারণ করিবার অনুপযুক্ত দেখা যায়, সেই শক্তি দেহগুলিকেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উন্নততর দেহ ধারণ করে। ইহাই মানুষের ইতিহাস —ধর্ম, সভ্যতা ও প্রগতির ইতিহাস।"[৭২]

নিবেদিতার সাহিত্য ও শিল্পচিন্তা

"মার্গারেট যেখানেই যেত, সেখানেই নির্ঘাত একটি সাহিত্যসংস্থা গজিয়ে উঠত"[১] নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ডের ভাষায় তার দিদির চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এই পরিচিতির দুটি দিক আছে—এক, তাঁর সাংগঠনিক শক্তি এবং দুই, তাঁর সাহিত্য প্রীতি। নিবেদিতা আবাল্য সাহিত্যপ্রেমিক। পরবর্তীজীবনে নানা কাজে তাঁর সাংগঠনিক শক্তিকে অধিকতর নিয়োজিত করতে হলেও বাল্যের সাহিত্যপ্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় নি

মাত্র ১০ বছর বয়সে পিতা স্যামুয়েলের মৃত্যু মার্গারেটের মনোজগতেই শুধু নিষ্ঠুর চিহ্ন রেখে যায় নি, তাঁদের পারিবারিক জীবনেও এনেছে বিপর্যয়ের সঙ্কেত। স্যামুয়েল ছিলেন আদর্শবাদী ধর্মযাজক—অর্থের দিকে, সঞ্চয়ের দিকে তিনি কোনোদিনই দৃষ্টি দেন নি। তাঁর অবর্তমানে সংসারের অর্থনৈতিক ভারসাম্য স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হয়েছে। আট বছর পর্যন্ত মার্গারেটের শৈশব কেটেছিল শান্ত, গ্রাম্য ধর্মীয় পরিবেশে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে; পিতামহীর মৃত্যুর পর বাবার কাছে এলেন এবং মাত্র দু'বছর পিতার নিকট সান্নিধ্য লাভ করলেন। সেই সান্নিধ্যের ফলে তাঁর ধর্মীয় ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে। স্যামুয়েল ছিলেন স্বাধীনতাচেতা নিষ্ঠাবান এবং চিন্তাশীল মানুষ। তাঁর 'উপাসনা-পদ্ধতি এবং অন্তরের ভগবদ্ভক্তিপ্রসূত ভাষণগুলি' মার্গারেটের কিশোরী মনের ওপর স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। পিতামহীর মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তারপর পিতাকে শ্রদ্ধায় ও সাহচর্যে নিবিড়ভাবে লাভ করে প্রথম শোকের বেদনা ভুলতে চলে-ছিলেন। ঠিক তখনই এসেছে কঠিনতর আঘাত—পিতার অকাল মৃত্যু। স্যামুয়েলের মৃত্যুর পর মা মেরী পুত্রকন্যাদের নিয়ে আয়ার্লণ্ডে নিজ পিতার সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হলেন। মেরীর বাবা ছিলেন

রাজনীতির এক বিশিষ্ট নেতা—আইরিশ হোমরুলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্বভাবতই তাঁর সংস্পর্শে এসে মার্গারেট দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

মার্গারেটের শৈশব ছিল বড় নিঃসঙ্গ। বয়সের তুলনায় প্রবীণতার ছাপ তার কাজকর্মে চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হতো। খেলাধূলা তাকে বিশেষ আকর্ষণ করে নি—গ্রন্থজগতেই ছিল তার সহজ স্বচ্ছন্দ চলার পথ। শৈশবের সেই সংগ্রামের দিনে যখন তিনি দারিদ্র্য, হতাশা ও বেদনার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছিলেন তখন সেই নিষ্ঠুর মুহূর্তগুলিও ভরিয়ে তুলতেন সহজাত শিল্প ও সাহিত্যবোধে। সে সব দিনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর ভগিনী শ্রীমতী উইলসন লিখেছেন: "সৌভাগ্যবশত এ হেন জীবনের কাঠিন্য ও আত্মনিগ্রহের ভার লাঘব হয়েছিল তার সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধে। এই শিল্পপ্রীতির জন্য সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে কিন্তু সে এমন কিছু পরমোৎসাহী সুপণ্ডিত অ্যাংলো ক্যাথলিকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসে যাঁদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখতে পায়। এই দুই সূত্র থেকে সে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের অমর প্রেরণা লাভ করে।"[২] মার্গারেটের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও রোমান্টিক স্বভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাই রিচমণ্ড বলেছেন, "বিদ্যালয় ত্যাগ করার আগেই ইভ্যানজেলিক্যাল মার্গারেট চার্চ অব ইংলণ্ডের 'হাই চার্চ' বা ট্রাকটারিয়ান আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে। এই আন্দোলনকে চার্চ অব ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতার অনুকরণ প্রয়াস বলা হয়ত অনুচিত হবে। যদিও এই আন্দোলনের অনেক অনুগামীই রোমান ক্যাথলিক মতের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকারী ছাড়া কিছুই নয়।··· ট্রাকটারিয়ানরা প্রকাশ্য পূজপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোযোগী, সাক্রামেণ্টের পূজাপদ্ধতির উপর জোর দেয় এবং ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে। অর্চনার আনুষ্ঠানিকতাকে তারা বর্ধিত করেছে, রোমান চার্চের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত এমন বহু আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রবর্ত্তন করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে অনেকাংশ শিল্পসুষমা পেয়েছে, এমন কি

রোমীয় নমুনাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সর্বজনীন পূজাপাঠে, তাদের অনবদ্য গন্থরচনা এবং উপাসনার অপূর্ব শিল্পরূপ এখানে তাদের সহায়তা করেছে।"[৩]

শৈশবে মার্গারেটের প্রিয় পুঁজি ছিল একখণ্ড জীর্ণ শেক্সপীয়র রচনাবলী। রিচমণ্ড তাঁর নিজের মনোবিকাশের ক্ষেত্রে মার্গারেটের প্রেরণার কথা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করে বলেছেন, "শেক্সপীয়রের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে মার্গারেট ভালবাসত। ম্যাকবেথ থেকে তার আবৃত্তি কি দারুণ হৃদয়গ্রাহী হতো, এখনো তা স্পষ্ট মনে আছে :

Is this a danger which I see before me
The handle towards my hands ?

কিংবা জুলিয়াস সিজার থেকে অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ :

Friends, Romans, Countrymen, lend me your eats···

তার ধ্বনিময় কণ্ঠের **For Brutus is an honourable man** এখনো আমার কানে সুস্পষ্ট বাজছে, যেন আজ সকালেই শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম।··· মার্গারেটই তার অতীব স্বল্প পুঁজি থেকে আমাকে পয়সা দিয়েছিল থিয়েটারে প্রথম নাটক দেখতে— 'কিং হেনরি দি এইটথ'—আরভিং অভিনয় করেছিলেন উপসির ভূমিকায় এবং ড্যালীতে 'টুয়েলভথ নাইট' এভারেহান যাতে ভায়েলা সেজেছিলেন। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপীয়রের লাইন বলতে পারেন নি।"[৪] কখনো কখনো ছুটির সময় লিভারপুল রোটানণ্ডার পথে ট্রেনে যাবার পয়সার অভাবে হেঁটে পাড়ি দিতেন দুই বোনে (মে)—সারাটা পথ আবৃত্তি করতে করতে যেতেন মার্গারেট পথের ক্লেশ দূর করতে।

মার্গারেটের আর এক প্রিয় কবি ছিলেন মিল্টন। শৈশব এবং পরবর্তীকালেও তিনি এমার্সনের বিশেষ ভক্ত। "এমার্সন ও যারা প্রচুর পড়েছিল"—সাক্ষ্য দিচ্ছেন শ্রীমতী উইলসন। এরিক হ্যামণ্ডও লিখেছে, "হুইটম্যান, এমার্সন, যারা তার অনুরাগের জিনিস। শেষ দুই

লেখকের রচনা থেকে প্রাচ্য দর্শনের সমর্থক যে কোনো অংশ অতীব তেজের ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্ধৃত করত।”[৫] এক সময় 'লেক ডিস্ট্রিক্টে' কোলরিজ ও সাদের বাড়িতে বাস করার সুযোগও মিলেছিল মার্গারেটের জীবনে। রাসকিনের এক ঘনিষ্ঠ পাত্রী বন্ধুর সহায়তায় সেখানে বাসকালে স্বাধীনভাবে সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবহার করে কাব্যিক ঐতিহ্যের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন।

যথাকালে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে তাঁদের দুই বোনের (মার্গারেট ও মে) শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছে—শিক্ষা-অন্তে ১৮৮৪ সালে কেসউইকের একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পেয়েছেন মার্গারেট। ১৮৮৬ সালে কিছুদিনের জন্য রাগবিতে কুড়িটি অনাথ শিশুর একটি বিদ্যালয়ে এবং তারপর রেক্সহ্যাম খনিমজুরদের স্কুলে শিক্ষিকারূপে যোগদান করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম সাহিত্য রচনার কথা (শিক্ষার্থীজীবনে রচনার কথা বাদ দিয়ে) উল্লেখ প্রসঙ্গে রিচমণ্ড লিখেছেন, “মার্গারেটের সাহিত্যচেষ্টার শুরু হয় সামসন জাতীয় লেখা দিয়ে। এই ধরনের লেখাকে নিখুঁত করার চেষ্টায় সে ব্রতী ছিল। বাইবেলের একটি অংশ বেছে নিয়ে তার ওপর সারমন লিখত।”[৬] এই সারমন রচনায় একটি বিশেষ ধরনের অনুশীলনী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম দশ বারো পাতা পুরো লিখে তারপর তিন-চার পাতার মধ্যে সংক্ষেপীকরণ এবং সবশেষে বক্তব্যকে ঘনীভূত করে মাত্র একপাতার মধ্যে সেটিকে উপস্থিত করতেন তিনি। এইভাবে সংক্ষিপ্ততার মধ্যে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর পরবর্তী কালের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য—যা আয়ত্ত করার প্রয়াস তখন থেকেই দেখা গেছে। সারমনের প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ পরবর্তী কালেও চোখে পড়ে। চিঠিপত্রে সারমনের উদ্ধৃতি-রচনাশৈলীতে সারমনের প্রভাব ছাড়াও 'এ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অব লাভ এ্যাণ্ড ডেথ' গদ্যভঙ্গী স্পষ্টই সারমন জাতীয় রচনার।

তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছে রেক্সহ্যামে বাসকালে। সেখানে খনিমজুরদের দারিদ্র্য, নারীদের (বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা) অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার

উপাদান যুগিয়েছে। তবে মার্গারেট কখনই রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে আপন বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর রোমান্টিক আদর্শবাদী চেতনা বাস্তবাশ্রয়ী হয়েও কখনো ইতিহাসের, কখনো দার্শনিকতার ছায়ায় বিশ্রাম পেয়েছে। শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু সঙ্গত কারণেই বলেছেন, "নিবেদিতা বস্তু সত্যকে কখনোই অস্বীকার করেন নি, কখনোই স্বীকার করেন নি একমাত্র সত্য বলে। অতীত জীবন্ত হতো তাঁর কল্পনায়, বর্তমান প্রদীপ্ত হতো তাঁর চেতনায়। ইতিহাসের কথা যখন তিনি বলেন, তথ্যের ব্যত্যয় না করেও তখন তিনি ঐতিহাসিক-উপন্যাসিক এবং বিজ্ঞানের কথা যখন বলেন তখন উপাদান অবিকৃত রেখেও বৈজ্ঞানিক-উপন্যাসিক।"[৭] রেক্সহ্যামের রচনার মধ্যে একটিতে একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলে, খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি অটুট বিশ্বাস তাঁর গোঁড়ামি-মুক্ত মন এবং অন্য ধর্মের সম্পর্কে কৌতূহল-মিশ্রিত শ্রদ্ধা। ১৮৮৭ সালে 'নেলাস' ছদ্মনামে লেখা 'শিশু-খ্রীষ্ট' রচনায় খ্রীষ্ট-প্রীতির পরিমাণ যথেষ্ট হলেও তিনি বলতে পেরেছেন, "ধর্মবোধের বুভুক্ষু ও সতৃষ্ণ অন্বেষণে কাঁটার মুকুটকে ও সৌন্দর্যের পূর্ণতাকে জানার গোপন রহস্যটি কি আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিখি নি? এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বুদ্ধের কথা না ভেবে পারি না, যিনি সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বহু শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। আমরা ভুলতে পারি না, সক্রেটিসের কথা যাঁর জীবন সত্যের প্রতি কঠিন আনুগত্যে পূর্ণ ছিল অথচ বিজয়ী লাবণ্যসিক্ত। নিঃসন্দেহে তাঁরা আছেন—বুদ্ধ এবং সক্রেটিসেরা, কিন্তু খ্রীষ্টের দোলনার উপর তাঁদের স্মৃতিবারি বর্ষণ হয়েছিল কি না কে বলতে পারে কিংবা তাঁদের ভাবৈক্যের মূলে মানব-প্রতিভার অখণ্ড উৎস রয়েছে কি না—তাই বা কে বলবে?"[৮]

এখানে থাকতেই তিনি মৌলিক ছোটগল্প লিখেছেন মার্গারেট নেলাস আণ্ডারউড ছদ্মনামে। মার্গারেট স্কুলের শিশুদের কাছে ভূতের গল্প শোনাতে ভালবাসতেন—কখনো কখনো মুখে মুখে নতুন তৈরী করেও ভূতের গল্প শোনাতেন। রেক্সহ্যামে লেখা "ডাইনী-পাওয়া" (**Hag-**

ridden) নামে যে একমাত্র লিখিত গল্পটির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে তাঁর অলৌকিক পরিবেশ রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মূল আবেদনটি কিন্তু ভৌতিক নয়—তা বঞ্চিত মাতৃত্বের বেদনার এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। সেই বুভুক্ষু মাতৃত্বের সঙ্গে মিশে আছে চিরন্তন সত্যানুসন্ধানের আবেগ, যা অলৌকিক ক্ষমতা অধিকারিণী জেনেও নাটকের ডাইনী পরিচয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। বৃদ্ধা জেনেত নিজের পরিচয় দিত গাছ-গাছড়া বিক্রেত্রী বলে কিন্তু সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে সে ছিল ভয় ও সম্ভ্রমের পাত্রী। তার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে সে খবর দিতে পারত—কার হারিয়ে যাওয়া ঘড়ি কোথায় পাওয়া যাবে, কার নাবিক স্বামীর সমুদ্রযাত্রার কালে মৃত্যু ঘটেছে। এই শক্তির জন্যই কেউ বা তাকে বলত ডাইনী, কেউ বলত জ্ঞানী বুড়ী। কিন্তু একদিন সে, পরাজিত হলো—তার একমাত্র সন্তান জন নাটাল খুনের অভিযোগে দীর্ঘকাল বন্দীদশা যাপন করছে। বুড়ীর ধারণা, প্রকৃত হত্যাকারী তার পুত্র নয়। সেই প্রকৃত হত্যাকারীর পরিচয়ই সে জানতে চেয়েছে তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা—কিন্তু সেখানেই তার পরাজয়। তারপর থেকে 'সে নিজের ভূমিতে সত্য সন্ধান' করে চলেছে। সর্বত্র এই রহস্যময় পরিবেশটি বজায় রেখে ছোটগল্পের রীতি অনুযায়ী ঘটনাধারার আকস্মিক পরিবর্তনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

এই সময় মার্গারেটের সাংবাদিক পরিচয়ও ফুটে উঠেছে অনেকগুলি লেখায়। 'এ্যান ওল্ড ওল্ড ওম্যান' ছদ্মনামে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ছ'টি প্রবন্ধ ১৮৮৮ সালের মধ্যে 'নর্থওয়েলস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় —সৌন্দর্যের অধিকার, কর্মের অধিকার, গৃহ নির্বাচনের অধিকার, অগ্রগতির অধিকার, জ্ঞানের অধিকার ও শাসনের অধিকার। প্রগতির নামে, আধুনিকতার নামে নারীর মধ্যে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার যে প্রচেষ্টা সমকালে দেখা দিয়েছিল, প্রবন্ধগুলিতে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে এক বৃদ্ধার সতর্কবাণী উচ্চারিত। এই বৃদ্ধার মতে "নারীর অধিকার মানে নারীর নিজস্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকার" —পুরুষের দৃষ্টিতে নিজেকে লোভনীয় করে তোলার হীনমন্যতার

বিরুদ্ধে লেখিকার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। এই রচনাগুলিতে যেমন তাঁর চারিত্রিক স্বকীয়তা দেখা দিয়েছে—তেমনি তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌন্দর্য কি? ছদ্মবেশী বৃদ্ধা বলেছেন, "আমাদের সংজ্ঞা মাত্র একটি কথায়, কিন্তু কথাটি স্বতঃ-অভিব্যক্ত। আমরা বিশ্বাস করি, সৌন্দর্য সামঞ্জস্য বা **harmony**-রই সমার্থক শব্দ এবং সামঞ্জস্য শব্দটি নারী এবং পৃথিবী, ফুল এবং কবিতা—সব কিছুর আকর্ষণের ভিত্তিটি প্রকাশ করছে।"[৯]

'জ্ঞানের অধিকার' রচনাটিতে মার্গারেটের দার্শনিকচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাব্যিক সৌন্দর্য। জ্ঞানের দার্শনিকতা বর্ণনা করেছেন ভাব-গম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষায়, "আত্মার মানমন্দির—যেখানে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের নক্ষত্র-ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। নির্বাক অনন্ত আকাশের পারে, অন্তত অতীতের ক্ষীণালোক থেকে বিশ্বসমূহ শক্তি ও তরঙ্গের বিরাট তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। তাকেই মানবমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যে সংহত করে আমরা বলি 'আমি জানি'। আর তা বলার কী অসীম আনন্দ ও যন্ত্রণা···কিন্তু এক লহমা মাত্র, তারপর আর অস্তিত্ব নেই···উল্লাস নিঃশেষিত এবং প্রকৃত সত্য হলো জ্ঞান নয় অজ্ঞানতার মধ্যেই রয়েছি আমরা কারণ রাত্রির সেই তিমির-গভীরতায় অনন্ত সত্যের মহিমময় ইন্দ্রধনুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের জ্ঞানের সত্তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, তার অস্তিত্ব আমাদের মস্তিষ্কের অসুস্থ অহমিকা ভিন্ন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না···তাই মানবজাতির মধ্যে যারা মহৎ আত্মা, তারা নীরবতা ও ঘনতমিস্রার মধ্যে বিনম্র ভক্তিতে এক সর্বব্যাপী আত্মার সম্মুখে শিশুর মতো শরণাগত হয়ে বলে 'আমি জানি না'। যখন সে 'জানি না'-তে পৌঁছয় তখনই নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, সে জেনেছে। আগে যা জানত তার থেকে অনেক অনেক ভাল করে জেনেছে।"[১০]

১৮৮৯ সালে রেক্সহ্যামের চাকরী ছেড়ে মার্গারেট চলে গেলেন চেস্টারে। রেক্সহ্যামে তাঁর কর্মজীবন শুধু যে শিক্ষকতার ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সাংবাদিকতার সূত্রে সমাজের নিম্নস্তরের জীবনের সঙ্গে একাত্ম

হতে পেরেছিলেন তিনি, তারই পরিচয় পাই 'এ পেজ ফ্রম রেক্সহ্যাম লাইফ' নামক রচনায়, যা প্রকাশিত হয় 'রেক্সহ্যাম এডভার্টাইজার' নামক পত্রে ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, অবশ্য 'এ লেডি' এই ছদ্মনামে। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, বেদনানৈরাশ্যের এই চিত্র মার্গারেটের বাস্তবজীবন-অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী দলিল—সেই অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যৎ মানবদরদী মনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। সেই রচনার কিছু অংশ :

"রেক্সহ্যামের চওড়া খোলা সোজা রাস্তার পিছনে আছে বস্তী ও সঙ্কীর্ণ গলির গোলক-ধাঁধা, যেখানে বাস করে এমন এক শ্রেণীর মানুষ যাদের আচার-আচরণ ও পরিবেশ আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক, দুষ্ট ক্ষতের মতো, আমাদের নাগরিক জীবনের প্রাণশক্তি তা কুরে খাচ্ছে। রেক্সহ্যামের অধিবাসীবৃন্দ, কান পেতে শুনুন, আমাদের শহরের ১২ হাজার অধিবাসীর ১২ ভাগের ৫ ভাগ লোকও মুক্তবায়ু বা আকাশের আলোর তলায় বিচরণ করে না।

আলো-অন্ধকারের দুই বিপরীত-জগতের পার্থক্য পরিস্ফুটনে কখনো কখনো সাংবাদিক মার্গারেটের লেখনীতে বস্তুবাদী ঔপন্যাসিকের শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, "খোলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি ; না, না ওগুলি তো রান্নাঘর নয়, ওই তো সবেধন নীলমণি শোবার ঘর। ভাগ্যবান যারা তাদের আলাদা শোবার ঘর আছে ; আর জঘন্যতর অবস্থা হলো, খিড়কি বলতে কিছু নেই—পশ্চাদ্দিকে শুধু নিরেট দেওয়াল, কোনো জানলা বা দরজা বা অন্য কোনো ভাবে যা বিচ্ছিন্ন নয় এবং ওধার থেকে আলো-বাতাসের পথ অবরুদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক গৃহপরিকল্পনার কালে অবাধ বায়ুচলাচলের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকৃত কিন্তু এখানে একমাত্র যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তা ডাস্টবিনের জঞ্জালগন্ধপরিপূরিত, ত্রুটিপূর্ণ জঘন্য ব্যবস্থাসৃষ্ট বিষ-জীবাণুতে ভর্তি—ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে, বেরুচ্ছে চিমনি নামক বিচিত্র জিনিসটির ভেতর দিয়ে এবং ঢেলে দিচ্ছে সর্বদিকে কৃমিকীটের জীবাণু, রোগ ও বিষের সম্ভার, যার ফলে গহ্বরটি—স্থানীয় লোকের

ভাষায় গৃহটি—পাপ ও মৃত্যুর মৃগয়াভূমি।”[১১]

এই রেক্সহ্যামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মার্গারেটের এক সুখদুঃখময় স্মৃতি, যা তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ওয়েলসের একজন বিজ্ঞান ও সাহিত্য অনুরাগী ইনজিনিয়র তাঁর নারীহৃদয়কে প্রথম স্পর্শ করেন। বন্ধুত্ব ক্রমশ পৌঁছল প্রণয়ে এবং উভয়ে যখন বিবাহের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন তখন অতর্কিত রোগাক্রমণে প্রাণ হারালেন তাঁর প্রথম প্রণয়ী। সুখময় জীবনের রঙীনস্বপ্ন-বিপর্যস্ত মার্গারেট ভাঙা মন নিয়ে রেক্সহ্যাম ত্যাগ করে এলেন চেস্টারে।

চেস্টারে শিক্ষকতাকালে আবার তাঁদের এতদিনের ছিন্ন পারিবারিক সূত্র যুক্ত হলো। ছোট বোন মে (পরে মিসেস উইলসন) ইতিমধ্যে শিক্ষা শেষ করে লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগদান করেছে—একমাত্র ভাই রিচমণ্ড ওখানেই কলেজে পাঠরত। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে মাকে আনিয়ে লিভারপুলে সকলের একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন মার্গারেট এবং নিজে যাতায়াত করে সাংসারিক জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চললেন। এখানে ‘গুড-সান্‌ডে ক্লাবে’র সদস্য হয়ে বক্তৃতা-দান এবং রচনাপাঠের সুযোগ মিলল। সাহিত্য আলোচনার সূত্রে ক্রমশঃ চিন্তাশীলতার পরিচয় সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শিশু-শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেই সূত্রেই ডাচ-মহিলা ডি-লিউর সঙ্গে পরিচয়। কিছুকাল পরে ডি-লিউর ডাক এলো তাঁর কাছে। লণ্ডনে তিনি নতুন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে একটি নতুন স্কুল খুলতে চলেছেন—মার্গারেটকে তিনি সহকারীরূপে পেতে চান। চেস্টারের পাঠ উঠিয়ে মাকে নিয়ে মার্গারেট চলে গেলেন উইম্বলডনে, মিসেস ডি-লিউর স্কুলে যোগ দিতে এবং এই উইম্বলডনেই ১৮৯২ সালে খুললেন নিজের স্কুল। এতদিনে তিনি স্কুল পরিচালনার স্বাধীন অধিকার পেলেন।

উইম্বলডনে লেডি রিপনের ‘মিসেস ক্লাবে’র সদস্য হলেন মার্গারেট। পরিচয় হলো, বার্ণার্ড শ, হাক্সলি, ইয়েটস-এর মতো সমকালীন চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে। তাদের বক্তৃতায় যোগদান করলেন, নিজেও বক্তৃতা

দিলেন ক্লাবে। বিদগ্ধ মহলে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইখানে থাকতেই তিনি নিজেও একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করেছেন। এরিক হ্যামণ্ড লিখেছেন, "তাঁর সাহিত্যপ্রীতি সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত হলো যখন ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি সপ্রমাণ কতকগুলি মানুষকে জুটিয়ে নিয়ে 'উইম্বলডন লিটারারী সোসাইটি' স্থাপন করলেন।

আয়ার্ল্যাণ্ড, ডেভন, হ্যালিফ্যাক্স, কেশউইক, রেক্সহ্যাম, চেস্টার, লিভারপুল, লণ্ডন—২৫।২৬ বছর ধরে শুধু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তর। ক্লান্ত মার্গারেটের আজ বড় প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট স্থানের। শ্রীমতী বারবারা ফক্স তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে লিখেছেন, 'there was building up in her longing for a settled place of her own."[১২] কিন্তু সে স্থিতি তো শুধু কায়িক নয়—সেদিন তাঁর মানসিক স্থিতিরও বড় প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গোঁড়া খ্রীষ্টান পরিবেশে তাঁর জীবন শুরু—সত্যের অনুসন্ধানে একদিন তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন—এড়ইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া'-য় বুদ্ধজীবনী পাঠ করে তাঁর মনে হয়েছে, "the salvation preached by him was decidedly more consistant with the truth than preachings of Christian religion". আঠারো বছর বয়সের পর থেকেই আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন প্রবল সংশয়ে আন্দোলিত। নাস্তিক্যবুদ্ধি কোনোদিন তাঁকে আশ্রয় করে নি কিন্তু সত্যের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের কোথায় যেন একটা বিরোধ রয়ে গেছে যাকে তিনি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারছেন না। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "For seven years I was in this wavering state of mind, very unhappy and yet very very eager to seek the truth."[১৩] সুতরাং একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানের জন্যই মার্গারেটর আগ্রহ নয়—তাঁর উদ্বেগ মানসিক সুস্থিতির জন্যও। সত্যের ভিত্তিভূমি তাঁর চাই—নইলে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবেন কোথায়! ছেলেবেলায় বাইবেল থেকে সারমন লিখেছেন, তারপর নিজেকে নিয়োজিত

করেছেন সাংবাদিকতায়, সাহিত্য রচনায়—কলম চলেছে, কিন্তু স্বকীয় ধারণার বনিয়াদ আবিষ্কার করতে পারেন নি। সর্বত্রই খুঁজেছেন স্বভূমি —যার ওপর তাঁর নিজের জীবনের, নিজের আত্মার সৌধ দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারে।

আটাশ বছর বয়সে মার্গারেটের জীবনে এসেছে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি। আমেরিকার ধর্মসভা-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের নাম তখন ইংলণ্ডের বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত। ১৮৯৫ সালের নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় একটি বৈঠকখানায় অল্প কিছু শ্রোতার সামনে বসেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দ। সভায় মার্গারেটও উপস্থিত। বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত স্তোত্র মার্গারেটকে যেন নতুন জগতে পৌঁছে দিল। তিনি সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছিলেন, শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। গৈরিক আচ্ছাদনে আবৃত সন্ন্যাসীর আয়ত অনাসক্ত দৃষ্টি, প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠ যেন কোন অচিন রাজ্যের বাণী বহন করে আনছিল। মার্গারেট সেই মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেলেন রাফেলের আঁকা শিশুখ্রীষ্টের দৃষ্টির সাদৃশ্য। তারপর ধীরে ধীরে মার্গারেটের চিত্তের সংশয়ের মেঘ সরে গেছে, বিবেকানন্দকে বসিয়েছেন গুরুর আসনে—মনে হয়েছে, তাঁর জীবনে যে মহৎ আহ্বানের জন্য এতদিন অপেক্ষা করে ছিলেন, সে আহ্বান তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন সুদূর ভারতবর্ষে। দীর্ঘদিনের খ্রীষ্টিয় সংস্কার থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়েছেন, নবজন্ম হয়েছে নিবেদিতায়। কিন্তু নিবেদিতা যাঁকে পিতার আসনে, গুরুর আসনে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি কি তাঁকে শুধুই আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়েছিলেন? রামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দের আদর্শ কি শুষ্ক সন্ন্যাস? না। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন শুধু বেদান্তবাদে নয়—ভারতীয়ত্বে। বিবেকানন্দের সাহিত্যচেতনা, সৌন্দর্যবোধ, শিল্পভাবনা নিবেদিতার দৃষ্টিকে পরিশীলিত করেছে নতুনতর উপলব্ধিতে। সাহিত্য ও শিল্পের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেলেন নিবেদিতা। আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গেই এসেছে সাহিত্য ও

শিল্পকথা—যা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। বেলুড়ের গঙ্গাতীরে সেই ছোট্ট বাড়িটিতে অথবা হিমালয়ের শান্ত ক্রোড়ে অথবা ঝিলম নদীর তীরে চিনার গাছের ছায়ায় কত স্নিগ্ধ প্রভাত ও শান্ত অপরাহ্ন মুখর হয়ে উঠত সংগীতে, স্তোত্রপাঠে, গল্পকথায়। 'সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, অথবা বিজ্ঞান—যা দিয়েই আলোচনা শুরু হোক না কেন শেষ পর্যন্ত পৌঁছত অদ্বয় অনন্তের কথায়।' এর মধ্যে দিয়েই নিবেদিতার হৃদয় উন্মোচিত হয়েছে। অনন্ত সৌভাগ্য তাঁর, এমন গুরুকে তিনি লাভ করেছিলেন যাঁর ভাণ্ডারে ছিল অগাধ ঐশ্বর্য—যিনি আনন্দের মূলসূত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি সাদরে সহাস্যে বরণ করে নিতে পারতেন দুঃখকে—বন্ধনমাত্রকেই যিনি ঘৃণা করতেন—যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও পারসিক কবির প্রেম-কবিতার রসাস্বাদন করে বলতে পারতেন 'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের জন্য আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে পারি', বলতে পারতেন, 'যে একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে পারে না তার জন্য আমি এক কাণাকড়িও দিতে রাজি নই'—পরক্ষণেই প্রেম ও প্রিয়তমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে গেয়ে উঠতে পারতেন :

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী
বাঁশি বলছে যে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই
কারু যেতে মানা নাই
ডাকছে বাঁশি আয় পিয়াসী জয় রাধে নাম করে।[১৭]

হিমালয়ের তুষারধবল বক্ষে 'বনরাজি নীলা'র অবলুপ্তিকে বোঝাতেন কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি অনুবাদ করে : **'Nature making eternal Suttee on the body of the Mahadeva.'** নিবেদিতার কবিমন সহজেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে—

Is not that grand ? Eternally renouncing her own life for Him ?[১৫]

সৌন্দর্যানুভূতির এ-হেন মুহূর্তগুলি নিবেদিতাকে পৌঁছে দিয়েছে

একটি স্থির লক্ষ্যে। পরবর্তীকালে বান্ধবী শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লিখেছেন তিনি, "তোমার নিশ্চয় মনে আছে, বেলুড়ের 'লন'-এ তিনি আমাকে যে কথা বলেছিলেন 'Come on this journey and I will make you 20 Mrs. Beasant.'—আমি এখন বুঝতে পারি, তিনি এমন একজন কাউকে চাইছিলেন যার মধ্যে নিজের অন্তর এবং চিন্তাসমূহ ঢেলে দিতে পারেন।" আর নিবেদিতাও তা গ্রহণ করেছেন অঞ্জলি ভরে, তার সামান্য অংশটুকুরও অপচয় হতে দেন নি "Oh, that I may never never harden my nature so as to lose one atom of it.[১৬]

শিল্পসাহিত্য ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে নিবেদিতার পরিণত উপলব্ধি : "লেখায় হোক বা রেখায় হোক সমস্ত মহান অভিব্যক্তিই সহানুভূতির জন্য এক মানবাত্মার হাহাকার এবং মানুষ কখনো বিদেশী ভাষায় নিজের অন্তর-বেদনা প্রকাশ করে না।"[১৭]

যে অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হলে একটি জাতির মহত্ত্বকে, তার ভাব-চেতনাকে উপলব্ধি করা যায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদানের মধ্যে সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য অনুভব করা যায় সে দৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে ও সহায়তায়। তারই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখতে পাই একটি পত্রে :

"Oh, rich is this life in elements of everything great and beautiful—Art, Drama and Nationality."[১৮]

নিবেদিতার দৃষ্টিতে "Art is charged with a Spiritual message in India to-day, the message of Nationality."[১৯] তাঁর মতে "ভারতের আধুনিকীকরণের জন্য সংবাদপত্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে শিল্পের মধ্য দিয়েই বড় কর্তব্য পালন করা সম্ভব" এবং "বিজ্ঞান, শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্যের মতো শিল্পের অনুশীলন করতে হবে মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার কাজে—এছাড়া আর কিছুর জন্য নয়।"[২০]

নিবেদিতার কালে ভারতীয় শিল্পীজগৎ য়ুরোপীয় শিল্পকলার অনুকরণে মোহগ্রস্ত। তাঁদের কাছে নিবেদিতার আবেদন, "সত্যকার কোনো কবি

তাঁর যাবতীয় কবিতার জন্য স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশী ভাষা বেছে নিতে পারেন না, তেমনি কোনো শিল্পীও শাশ্বত মূল্যের কোনো সম্পদ রচনা করতে পারেন না যা তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে বোধগম্য নয় ।··· ভারতীয় চিত্রকে যদি সত্যই ভারতীয় এবং প্রকৃত মহৎ হতে হয় তাহলে তাকে ভারতীয় ভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করতে হবে —এমন কোনো অনুভূতি বা ভাবের বাহন হতে হবে যা ভারতীয়দের কাছে হয় পরিচিত না হলে অন্ততপক্ষে সরাসরি গ্রহণযোগ্য ।”[২১]

ভারতীয় দৃশ্যসম্পদে শিল্পের অফুরন্ত উপাদান ছড়িয়ে আছে—ভারতীয় শিল্পীরা কেন নকল করবে বিদেশ থেকে ? সেই অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যে নিবেদিতা মুগ্ধ—প্রগলভ। বলছেন, “শিল্পের পুনর্জন্ম চাই—কিন্তু এখন যা দেখছি, সেই ইউরোপীয় শিল্পের করুণ অনুসরণ নয়। মানুষের হৃদয়ে পৌঁছবার ভাষা শিল্পের যেমন আছে আর কিছুরই তা নেই। একটি গান, একটি ছবি যেন অগ্নিময় ক্রুশ, যা মানুষের প্রাণে গিয়ে আঘাত দেবে, সকলকে এক করবে। শিল্পের অবশ্যই পুনর্জন্ম হবে—কারণ সে আজ নতুন উপকরণ পেয়েছে—সে উপকরণ ভারতবর্ষ স্বয়ং। মাদ্রাজের উপকূলের পথে, ঐ ছিন্নবাস পরিহিত চলমান পারীয়ার সৌন্দর্য যদি ব্রোঞ্জের ওপর ফুটে উঠত আর জগতকে উপহার দেওয়া যেত ! আঃ, যদি সমুদ্রের তীরে ঊষালগ্নে পূজারতা ঐ নারীর মূর্তি ধরা পড়ত জলরঙে। হায় যদি পেন্সিলের ছন্দে রূপায়িত হতো ভারতীয় শাড়ির অপরূপত্ব, ঐ মন্দির, গ্রামের শান্ত জীবন, গঙ্গাতটে নরনারীর আসা-যাওয়া, শিশুদের খেলা, গাভীদের কর্মরত জীবন এবং তাদের মুখগুলি !”[২২]

প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট ঘটনা ও উৎসবগুলিতে যে শিল্পমাধুর্য বিধৃত হয়ে আছে তাকে দুচোখ ভরে দেখেছেন তিনি, উপলব্ধি করেছেন গভীর তাৎপর্য—নবযুগের শিল্পীদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন সেই-দিকে :

“যা আমাদের সামনে দিগন্ত উন্মোচিত করে দিতে পারে, এমন কোনো চকিত দৃশ্যের মধ্যে যেতে পার না? য়ুরোপের যেকোনো স্থানের

চেয়ে এখানে সেটা সহজে দেখতে পাওয়া যায়।···সন্ধ্যায় তুলসীতলায় মাটির প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না? সন্ধ্যায় সমবেত নরনারীর উপর শান্তিজল বর্ষণের অনুষ্ঠান কি তোমার মধ্যে শান্তির স্পর্শ আনে না? বরণডালার মিষ্টিক সৌন্দর্য কি অনুভব করতে পার? বিশ্বাস কর, এই ধরনের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া, এ ধরনের কোনো আবেদন ছাড়া, তোমার ইংরেজি স্কুলে মুখস্থ করা কারিগরী উৎকর্ষ হলো মাংসহীন অস্থি মাত্র। এগুলো অপদার্থের চেয়েও অপদার্থ।"[২৩]

"Everyone in India can draw" নিবেদিতা লিখছেন ম্যাকলাউডকে, "The country is full full full of artistic talent." কিন্তু যদি সাহায্য পেতেন কোনো ইউরোপীয় শিক্ষকের! তাতেও তো আছে বিপদের গন্ধ—নিবেদিতা স্বয়ং যেভাবে শিক্ষালাভ করে ভারতকে জেনেছেন, তার অন্তরকে চিনেছেন তা যদি সেই বিদেশী শিক্ষকের না থাকে! সুতরাং নিবেদিতার আক্ষেপগুলি "সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য আমি যদি একজন না হয়ে তিনজন হতাম!"[২৪]

আবার ওলি বুলকে একটি চিঠিতে লিখছেন: "দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় **design**-এর উৎস রয়েছে মেয়েদের মধ্যে, যা এখনো পর্যন্ত অব্যবহৃত। এগুলি আশ্চর্যজনক কাজ দিতে পারে। ভারতবর্ষ এখনও নানা রূপকল্পে পূর্ণ এবং সেগুলি ভারী চমৎকার।"[২৫]

ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ১৯০২ সালে। সমমতাবলম্বী হ্যাভেলকে পেয়ে নিবেদিতা যেমন খুশী হয়েছিলেন হ্যাভেলেরও তেমনি আনন্দের কারণ ছিল। ভারতীয় শিল্পের রহস্য এবং সংগুপ্ত অর্থের জন্য হ্যাভেল নিবেদিতার শরণাপন্ন হতেন। নন্দলাল বসুর কথায় জানতে পারি ভারতীয় শিল্পকলার নন্দনতত্ত্ব এবং দার্শনিক বক্তব্য নিবেদিতাই হ্যাভেলকে বুঝিয়ে দিতেন।[২৬] হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পকলার মহান ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তা যে মৌলিক, গ্রীক

প্রভাব-জাত নয়, সে কথা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন, যা সমকালীন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতের বিরোধী। স্বভাবতই হ্যাভেলের শিল্পসম্পর্কিত মতবাদ (যা নিবেদিতার অনুরূপ) সরকারী আমলাদের বিরূপ করে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত হ্যাভেলকে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সঙ্গে আনন্দ কুমারস্বামীর নামও স্মরণ-যোগ্য। তিনিও ছিলেন একই মতবাদে বিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতা—হ্যাভেল—কুমারস্বামী, ভারতীয় শিল্পকলার উপর গ্রীক প্রভাবের অলীক থিয়োরীটির বিরুদ্ধে সংযুক্তভাবে সংগ্রাম করে গেছেন।

১৮৯৯ সালে স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণকালে নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পকলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুধাবনের সুযোগ পান। একই বৎসরে চিকাগো শহরে স্বামীজীর উপস্থিতিতে তিনি ভারতীয় চারু ও কারুশিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প পাশ্চাত্যপ্রভাবে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি দেখাবার জন্যে তিনি কিছু ছবির নমুনা চেয়ে পাঠিয়ে শ্রীমতী বুলকে লিখেছেন :

অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল সুরেন করকে পাঠিয়েছিলেন অজন্তায়। (২) নিবেদিতার প্রবল উৎসাহ কোনো বাধাকেই স্বীকার করে নি। মিসেস হ্যারিংটনের নিরুত্তাপ পত্র তাঁকে দমাতে পারে নি এবং শিল্পীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁদের আহার্যের যাবতীয় ব্যবস্থা করে গণেন মহারাজকে পাঠিয়েছেন অজন্তায়। অবশ্য সেবার এই বাঙালী শিল্পীদের জন্যই হ্যারিংটনকে বেশ খানিকটা ঝামেলা ভোগ করতে হয়েছিল—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্রতিকূলতায়।

নিবেদিতার মৃত্যুর পর হ্যাভেলকে সেই সংবাদ জানিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'Perhaps you have heard that our Sister [Nivedita] died in Darjeeling last month. It will be hard to find another like her again. How keenly we feel her loss." (Letters of S. Nivedita Vol. II 1287)

ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীকে বাইরের জগতে পরিচিত করতে, তাদের

অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে নিবেদিতা সেল্‌স্ এজেন্টের ভূমিকা গ্রহণেও প্রস্তুত। প্রিয়নাথ সিংহের কাছে একটি পত্রে লিখেছেন বিদেশ থেকে :

"ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ গ্রন্থাগারে আমি পার্চমেণ্ট কাগজে দেবনাগরী হরফে একটি চমৎকার পুঁথি দেখেছিলাম।—দুপাশে নক্সা—যার সোনালি 'আউটলাইন' সবুজ, ফিকে লাল এবং নীল পাতা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছবি আঁকা। [নিবেদিতা চিঠির মধ্যে ছবিগুলির স্কেচ করে দেখিয়েছেন]। পুঁথিটির পাতা চওড়ায় ৩২ ইঞ্চি—লম্বায় ৩৫ কিংবা ৪২ ইঞ্চি। লেখা ঘনবদ্ধ।...তুমি কেন এই ধরনের পুঁথি তৈরী কর না ? লেখার কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পার—তোমার স্ত্রী কিংবা তাঁর বোনও সে কাজ করতে পারে, আঁকার কাজটা করবে তুমি। ভর্তৃহরির নির্বাণ অথবা গীতার যে কোনো অধ্যায় বা স্বামীজীর নারী সংক্রান্ত চমৎকার বাংলা রচনা লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে পার। চেষ্টা করে দেখ। এই ধরনের লেখা ও ছবি-সমেত কিছু কার্ড যদি খ্রীষ্টমাসের আগে তৈরী করতে পার তাহলে আমি আমেরিকায় সেগুলি বিক্রী করার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"[৩১]

ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে, শিল্পীদের সহায়তায় নিবেদিতার ভূমিকা সমকালীন শিল্পীদের কতখানি উৎসাহিত করেছিল তা জানতে পারি তাঁদেরই কথা থেকে। সেকালে শিল্পীরা বোসপাড়া লেনের সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে সবাই গেছেন—সেখান থেকে পেয়েছেন উত্তপ্ত স্নেহ, নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক নির্দেশনা। নন্দলাল বসু লিখেছেন, "নিবেদিতার এমন একটা তেজস্বিতার দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমরা দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে জীবনে ভুলতে পারা যায় না। তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতুম কিন্তু প্রকাশ করা কঠিন। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা সত্যিই অনুভব করেছিলুম একজন যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা হারিয়েছি।"[৩২]

অসিত হালদার বলেছেন, "আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-

কাল।…ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয়জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারের বাসায় যেতাম। আমাদের উপদেশছলে বার বার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্টস ছেড়ে পলিটিকসে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নব-জাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে বড় কাজ।…আমাদের বার বার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে।"[৩৩]

নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর একখানি ছবি সংগ্রহ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেটিকে রেখেছিলেন নিজের টেবিলের উপর প্রেরণার উৎসরূপে। অবনীন্দ্রনাথের মতে লর্ড কারমাইকেলের মতো 'আর্টিস্টিক নজর বড় কারো ছিল না।' সেই কারমাইকেলের চোখে একদিন পড়ল ছবিটি। তিনি সকৌতূহলে প্রশ্ন করলেন, 'এ কার ছবি ?' অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'সিস্টার নিবেদিতার।' 'এই সিস্টার নিবেদিতা ? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।' বলেই কারমাইকেল কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করেই 'সেই ছবিখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন।' অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'তাঁর (নিবেদিতার) কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে জোর পাওয়া যেত।'[৩৪]

এইকালে নিবেদিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ শিল্প সমালোচনা। 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' গ্রন্থে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "ভগিনী নিবেদিতা, উডরফ, জেমস কাজিন ও অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা শিল্প-সমালোচনার যে নূতন আদর্শ দেখা দিয়েছিল সেটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় রসিক সমাজে আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।" (পৃঃ ২৫) এগুলি একদিকে যেমন তাঁর শিল্পদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও অসামান্য হয়ে উঠেছে। নিবেদিতার কবি-চিত্ত চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-বিশ্লেষণে যেন তার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলি শিল্প-সমালোচনার

অপূর্ব সম্পদ। প্রবাসী পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত-মাতা'র চিত্রের সমালোচনায় উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা লিখলেন: "We have here a picture which bids fair to prove the beginning of a new age in Indian Art." অবনীন্দ্রনাথের 'সীতা' চিত্রের সমালোচনায় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার মন্তব্য: "But the ideal lives for us at last. The Indian Madonna has found a form." অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' চিত্র দুটিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিবেদিতার সমালোচনায়। ১৯০৮ সালের এপ্রিল সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিউ'-তে নন্দলাল বসুর সতী চিত্রের সমালোচনা—"যদি এটি কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা হতো, তাহলে আমরা এই বিষয়টিকেই নিঃসন্দেহে উপস্থাপিত হতে দেখতাম, পুরো অবয়বে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক তার গৌরবান্বিত সৌন্দর্য নিয়ে বিজয়িনীর মতো দর্শকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নন্দলাল যে-ভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় চেতনার পরিস্ফুটনে তার চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না।"[৩৫] ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় নন্দলালের 'তাণ্ডবনৃত্য' চিত্রের সমালোচনায় ভারতীয় শিল্পের মর্মকথাকে উন্মোচিত করে নিবেদিতা লিখলেন, "Again, as is so often a case with these Indian pictures, we are in the presence of a work so psychological, so meditative, so intense, that the faculty of criticism ceases before it and we are swept away by the idea that seized the artist and made to contemplate that alone."[৩৬]

উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুখলতা রাও, অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্তর চিত্রের সমালোচনাও করেছেন তিনি। ভারতীয় শিল্পকে লোকসমক্ষে উপস্থিত করার জন্য চিত্রগুলির আলোকচিত্র সমেত প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। নিবেদিতা কিন্তু তখনই নির্মম যখন যখন ছবিতে 'শিশুসুলভ ইউরোপীয় অভ্যাস' প্রকাশ পেত কিংবা প্রয়োজনীয় 'পৌরুষ স্পর্শে'র (masculine touch) অভাব ঘটত। পরিমিতিবোধের দৈন্য

কিংবা বৈচিত্র্যের জন্য অন্ত্যলিপির ব্যবহার নিবেদিতাকে পীড়িত করত এবং স্বভাবতই সেক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য হতো অত্যন্ত কঠোর।

'ডিটেলস'-প্রতি নিবেদিতার সূক্ষ্ম দৃষ্টির দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করি। একবার নন্দলাল বসু একটি ছবি এঁকে নিয়ে গেছেন নিবেদিতাকে দেখাতে—মৃত্যু শয্যায় দশরথ, কৌশল্যা তাঁর পাশে বসে হাওয়া করছেন। ছবিটি দেখে নিবেদিতা খুব খুশি—চমৎকার পরিবেশ ফুটে উঠেছে—যেন শ্রীমায়ের শান্তিময় ঘরখানির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ কী? কৌশল্যার হাতে একটা সামান্য তালপাতার পাখা? কৌশল্যা রাণী—গজদন্তের তৈরী পাখা তার হাতে মানাতে পারে। নন্দলালকে বললেন, একবার মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসো, এই ধরনের হাতের কাজ আছে কি না।[৩৭]

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় অন্য একজন শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই আঁকা বুদ্ধমূর্তি নিবেদিতাকে দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে গেছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিটা দেখলেন নিবেদিতা, বললেন, "বুদ্ধের মুখ এঁকেছ, নাকটা চাইনিজদের মতো খাঁদা করেছ কেন? তিনি একজন ভারতীয় রাজপুত্র, ভারতীয়রা কি চাইনিজদের মতো খাঁদা নাক নিয়ে জন্মায়? তোমরা ঐ চাইনিজ, জাপানিজ স্টাইল অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেবে কেন? তা ছাড়া ভারতীয়ের মূর্তি, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর কোনো দেশের এমন কি রোমান-গ্রীকদের চেয়ে কম ছিল কি?" প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "তাঁর কথায় আমাদের অন্তরে যেন আলো জ্বলে উঠল। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা।"[৩৮]

ভারতীয় শিল্পের মহৎ ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নিবেদিতা কিন্তু গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে তিনি আধুনিক ইউরোপীয় প্রখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের সঙ্গেও ভারতীয় শিল্পীদের পরিচিত করে দেবার চেষ্টা করেছেন। প্যুভি-দ্য-শভাঁনে; জে. এফ. মিলেট, ডাগবান বোভার্ট, রিখটার প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবির প্রতিলিপি আনিয়ে পরিচিতি সমেত প্রবাসী পত্রিকায় ছাপিয়েছেন।

১৯০৭ সালে ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পশিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার

উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্য শিল্প সভা—যার পরবর্তী কালে নাম দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট। সেই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, বিচারপতি উডরফ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।[৩৯] সেই সোসাইটির উদ্যোগে যে শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো তারই একটির পরিচিতি প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, "These were some of the paintings for which the recent exhibition will be long memorable. 'Old Favourities' by Mr. Abanindranath Tagore, and the wonderful impressionist sketches of his brother Gaganendra Nath were placed on the walls, as a sort of back-ground and filling, for the works of students and disciples. And for ourselves, we came away much gladdened for never had the continuity of the new school with the old, been so convincingly demonstrated, and we felt, in that fact, many miles nearer to our dream—the great Indian School of mural painting, historic, national and heroic, which is to be the gift of the future to the chosen Land."[৪০]
সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত 'আনপাবলিশড নোটস অফ সাম ওয়াণ্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তিকার সংযোজন অংশে সম্পাদক শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী তাঁর প্রতিবেদনে নিবেদিতার শিল্পচিন্তার একটি চমৎকার নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে নিবেদিতা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং সাংকেতিকতাকে যে কতখানি মূল্য দিতেন এই আলোচনার মধ্যে সেটি সম্পাদক দেখাতে চেয়েছেন। ডায়েরীর উৎসর্গ পত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীনিয়োগী জানিয়েছেন একটি অশ্বত্থপত্র পৃষ্ঠার মাঝখানে সংযুক্ত—নিচে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি: **I am Gabriel that stand in presence of God.** ডায়েরীর দ্বিতীয় খণ্ডেও অনুরূপ পরিকল্পনা অনুসৃত। বরেনবাবু জানিয়েছেন, অশ্বত্থপত্র

স্বাভাবিক অবস্থায় যে-ভাবে থাকে এখানে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে পিরামিডের পদ্ধতিতে অর্থাৎ পত্র-শীর্ষ উপরদিকে স্থাপন করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি অনুমান করেছেন, পত্রদুটি বোধিবৃক্ষ থেকে সংগৃহীত এবং এইভাবে পত্রস্থাপনার মধ্যে বুদ্ধের সঙ্গে স্বামীজীর একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নিবেদিতা। বুদ্ধের সাধনা ও নির্বাণ-লাভের মধ্যে অর্থাৎ নিম্নস্তর থেকে চরমতম স্তরে পৌঁছানোর সংকেতটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তপঃশক্তিকে বলা হয় 'তেজ'—অন্যনামে অগ্নি। অশ্বত্থবৃক্ষের ঊর্ধ্বমুখী স্থাপনায় সেই অগ্নিরূপও পরিস্ফুট। এই সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের উক্তিটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। নিবেদিতা অন্যত্র স্বামীজীকে গ্যাব্রিয়েল বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি এই উৎসর্গ-পত্রের মধ্যে, বিবেকানন্দ-বুদ্ধ-গ্যাব্রিয়েলের সমন্বিতরূপই উপস্থিত করেছেন উৎসর্গে ব্যবহৃত প্রতীক ও উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে।

এই দার্শনিক তাৎপর্য ছাড়াও শিল্পগত দিক থেকেও এর মূল্য অপরিসীম বলে শ্রীনিয়োগী মনে করেন। তিনি লিখেছেন, "The leaf has divided the paper in a very interesting and fascinating way and the whole composition along with writings at the above and below it, is well balanced. The work shows great power of artistic quality highly developed in her." এই সূত্রে বরেনবাবু দাবী করেছেন, উনিশ শতকের শেষভাগে নিবেদিতাই প্রথম 'কোলাজ' রীতির উদ্ভাবন করেছেন এই উৎসর্গ পত্রে। সাধারণতঃ ব্রেককে (Braque) কোলাজের প্রবর্তক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তিনি ১৯১১ সালের কাছাকাছি সময়ে কোলাজ রীতি ব্যবহার করেন এবং পিকাসো তাঁকে অনুসরণ করে এই রীতিকে উন্নততর করেন। নিবেদিতা তার অনেক আগেই এই রীতি প্রবর্তনের নিদর্শন রেখে গেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকতার সংযোগে চিত্রশিল্প এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে যা ছিল ব্রেক বা পিকাসোর ধারণার অতীত।

নিবেদিতার চোখে শিল্প সুন্দর—কিন্তু সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য জাতির

সর্বাঙ্গীণ জাগরণ, জাতীয়তার উদ্বোধনে। তাঁর শিল্পচেতনা ভারতীয় জাতীয় জাগরণেরই একটি অংশ। যেখানে যা কিছু ভাল দেখেছেন, ভাল পেয়েছেন, সেখানেই তিনি অন্বেষণ করেছেন ভারতবর্ষকে। ভারতের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজেকে আবিষ্কার করার প্রেরণায়। আনন্দকুমারস্বামীর 'মিডিয়েভাল সিলোনিজ আর্ট' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কালজয়ী রচনা এবং রচিত হয়েছে প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে এমন একজনের দ্বারা যিনি পাশ্চাত্ত্য বিষয়েও অনুরূপ দক্ষতার সঙ্গে আলোচনার অধিকারী। যাঁরা লেখককে জানেন তাঁরা তাঁর কাছ থেকে আরও রচনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকবেন।— কিন্তু ভারতবর্ষ বিষয়ে এই প্রকৃতির গবেষণার জন্য পণ্ডিতদের প্রচেষ্টা কোথায়?...কোথায় সেই মানুষেরা যাঁরা এগিয়ে এসে নিজেদের শক্তি উৎসারিত করবেন এবং মাতৃভূমির সম্পদকে এইভাবে প্রণালীবদ্ধ করবেন? এই ধরনের আক্রমণের—অসাধ্য প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির পট-ভূমিকাই স্বদেশ-চেতনা এবং জাতীয় মূলমন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারে।...এই কর্তব্য সাধনে প্রেমিকের আবেগ, কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুর পেলব হৃদয় ঠিক যতখানি দরকার ততখানি প্রয়োজন দৃষ্টি ও মস্তিষ্কের অনুশীলনী। তখন, একমাত্র তখনই আমরা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের সূত্র খুঁজে পাব যাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।"[৪১]

এবার আসি সাহিত্যের কথায়।

বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য-রসিক নিবেদিতা উৎসাহী সাহিত্য পাঠক এবং উৎসাহী লেখকও। কিন্তু লেখক যতক্ষণ না নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন, যতক্ষণ না স্বকীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন ততক্ষণ তাঁর সমস্ত প্রয়াস ক্লান্তিকর পরিশ্রম মাত্র। কিন্তু যখন স্থির বক্তব্যের নিশানা লাভ করেন তখন তাঁর সমগ্র চেতনা এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়—তখন তাঁর কথা আর ফুরোয় না। সেই বক্তব্যের উৎস আবিষ্কারে উল্লসিত নিবেদিতা লিখেছেন, "দিনের পর দিন আমি কলম নিয়ে বসেছি কিছু বলব বলে কিন্তু কিছুই বলতে

পারি নি। আর এখন? আমার কথার যেন শেষ নেই। নিশ্চিতভাবে আজ আমি যেমন পৃথিবীতে আমার নিজস্ব স্থানটিতে এসেছি পৃথিবীও যেন আমারই প্রয়োজনে এতদিন অপেক্ষা করে ছিল। ধনুকে তীরটি তার উপযুক্ত স্থানটি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যদি তিনি (বিবেকানন্দ) না আসতেন অথবা বিচক্ষণ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁকে যেমন দেখতে চেয়েছিলেন, সেইমতো হিমালয়ের চূড়ায় বসে ধ্যান করতেন তাহলে অন্তত আমি আজ যেখানে, সেখানে কিছুতেই পৌঁছতে পারতাম না।"[৪২]

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগে বান্ধবী শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "আমি জানি, এবং আমার আদরের মা য়ুম, তুমিও জানো, এ যা কিছু সবই স্বামীজী, সব স্বামীজী, সব স্বামীজী।"[৪৩] নিবেদিতার গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্যচেতনার উৎস অনুসন্ধানে এই মূল কথাটাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

বাল্য, কৈশোর ও প্রারম্ভ-যৌবনে নিবেদিতার সাহিত্যপ্রীতি ও রচনা-প্রয়াসের মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি। স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভের পর তাঁর সাহিত্য-পাঠের পরিধির বিস্তৃতি ও সাহিত্যবোধের ব্যাপকতা ঘটেছে। স্বামীজী তাঁকে কিভাবে বিশ্বসাহিত্যের, বিশেষ করে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে পরিচিত এবং সে সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলেছিলেন, কিভাবে তিনি তাঁর সম্মুখে সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, নিবেদিতার রচনা ও পত্রাবলীতে তার পরিচয় পাই। স্বামীজী যেমন-বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, চণ্ডী, গীতা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, গ্রন্থসাহেব, কোরাণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে সেগুলির প্রতি তাঁকে অনুরাগী করে তুলেছেন, তেমনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, কালিদাস, ভর্তৃহরির রচনা, ললিতবিস্তর, বাংলা নাটক, কবিতা, গান প্রভৃতি সকল উপকরণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। এগুলি যে নিবেদিতার অন্তর্জগতে বিপুল পরিবর্তন এনেছিল এবং সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় তাঁকে বন্ধুর মতো সাহচর্য দিয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। মাণ্ডুক্য

উপনিষৎ অনুবাদ করে মোহিত সেন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটি পাঠ করে নিবেদিতা অনুবাদককে লিখেছিলেন, "(আপনার অনুবাদে) আমি আমার অনেক পরিচিত বন্ধুকে পাচ্ছি—যেগুলি আমার গুরু প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন।" এই পত্রেই নিবেদিতা তাঁর একটি সাহিত্যিক প্রবণতার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন, "তবে আমার একটা ইচ্ছার কথা বলি—আপনি এগুলি অতুলনীয় গদ্যে অনুবাদ করুন। আমাদের ইংরেজি প্রার্থনাপুস্তকের স্তোত্রগুলির মতো লিরিক গুণসম্পন্ন গদ্য-সংগীতের আমি কট্টর সমর্থক।"[৪৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যসংগীত ভালই জানতেন এবং গাইতে পারতেন। ভারতীয় প্রাচীন সংগীতও তাঁর একেবারে অজানা ছিল না এবং স্বতঃই সে জ্ঞানও তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে। ডক্টর টি. কে. চেনি-কে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "Next time I see you, will you let me chant you the little tune that I caught from my master—only one cadence—out of the ancient music. It came to him from Sri Ramkrishna and to me it sums up the whole, and is an immediate and blessed key."[৪৫]

১৮৯৯ সালে অর্থাৎ কলকাতায় পৌঁছবার এক বছর পরেই দেখতে পাই নিবেদিতা সংস্কৃত ও বাংলার সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ও সরলাদেবীর আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা, তাঁদের দ্রুত আলাপচারিও যে তিনি কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলেন সেটা চিঠিতে জানিয়েছেন, "এ সবই (কথাবার্তা) সংস্কৃত এবং বাংলায়—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি।"[৪৬] নিবেদিতা মারফৎ আমরা পেয়েছি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের স্বামীজী-কৃত বহু অনুবাদ—যাতে স্বামীজীর অনুবাদের নমুনাই শুধু নয় নিবেদিতার মানসিক বিবর্তনের পরিচয়ও উদঘাটিত হয়েছে। ১৮৯৯ সালের ১১ নভেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ—যা ধারণার অতীত। প্রথমে

তিনি (স্বামীজী) দুষ্টামি-ভরা শিশুর মতো ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর পরিচয়ে কালীমায়ের কথা শুরু করলেন—তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে গেলেন—ক্রমশঃ কোমলতা ও প্রার্থনায় পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর বক্তব্য :

That mother who is manifest in all beings
Her we salute
She whom the world declares to be the great Maya
Her we salute···

(যা দেবী সর্বভূতেষু ইত্যাদি)

এবং তারপর

The breeze is making for righteousness
The seas are showering blessings on us—
Our father in heaven is blissful,
The trees in the forest are blissful, so are the cattle,
The very dust of the earth is luminous with bliss—
It is all bliss—all bliss – all bliss.

(মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইত্যাদি)

I may have been mistaken—but it seemed to me all those two days as if this note of bliss were there, though only as an undertone now and then breaking into triumph."[৪৭]

নিবেদিতার রচনাবলীতে রুদ্রস্তোত্র বহু উদ্ধৃত—যা তিনি পেয়েছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে এবং ব্যবহার করেছেন মূলমন্ত্ররূপে :

From the unreal lead us to the Real
From the darkness lead us unto Light
From death lead us to Immortality
Reach us through and through our Self
And evermore protect us—O Thou Terrible
From ignorance, by Thy Sweet Compassionate Fase

(অসতো মা সদ্‌গময় ইত্যাদি)

সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত 'আনপাবলিশড নোটস'-এ ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের মোট ৩৬টি শ্লোকের স্বামীজীকৃত অনুবাদ পাওয়া যায়। বৈরাগ্যশতক যে নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তার প্রমাণ তিনি পরবর্তীকালে স্বয়ং ভর্তৃহরির অনুবাদ সাগ্রহে সংগ্রহ করে পড়েছেন। চিকাগো থেকে ২০শে এপ্রিল ১৯০০ তারিখের পত্রে শ্রীমতী লেগেটকে লিখেছেন : "আমি এখানকার গ্রন্থাগার থেকে কয়েক ডজন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ পেয়েছি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি এর কয়েকটির মধ্যে কি অনুপম সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে। একজন ইংরেজ-পাদ্রী অনূদিত ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক চমৎকার…"

ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের একটি শ্লোক কবি নিবেদিতাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। 'ওয়েভ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : "And nowhere are we more impressed by the completeness of Eastern Idealism, than in this, its relating itself to Nature." প্রকৃতির সংগে সংযোগ সাধনায় একটি আশ্চর্য নিদর্শন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকে :

Oh, Mother Earth, Father Sky,
Brother Wind, Friend Light
Sweet heart Water,
Here take my last salutation with folded hands!
For to-day I am melting away into the Supreme,
Because my heart became pure,
And all delusion vanished
Through the power of your good company.[৪৮]

মূল শ্লোকটি হলো :

মাতর্মেদিনী তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণমাঞ্জলিঃ

যুষ্মৎ সঙ্গোবশোবজাতসুকৃত স্ফার স্ফুরন্নির্মল—
জ্ঞানাপাস্তসমস্ত মোহমহিমা লীয়ে ব্রহ্মণি ॥

নিবেদিতা নিজেও সংস্কৃত এবং বাংলা থেকে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন, তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনার মধ্যে সেগুলি ছড়িয়ে আছে। এগুলির অনুবাদে স্বামীজীর অনুবাদের যথেষ্ট সাহায্য নিলেও তাঁর স্বকীয়তা আছে সন্দেহ নেই। খেতরীর রাজসভায় গীত বাঈজীর গানটির (প্রভু মেরে অবগুণ চিতে না ধরো···) অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে :

O Lord, look not upon my evil qualities !
Thy name, O Lord, is same sightedness,
By thy touch, if Thou wilt, Thou canst make
me pure

পাদটীকায় নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন, "আক্ষরিক অর্থ করলে Make us both the same Brahman—i.e. Let the singer may be one with God Himself in the Supreme Essence—Brahman. এখানকার (ভারতবর্ষের) Theosophical conception পশ্চিমের পাঠকের পক্ষে এত কঠিন যে আমি সহজতর বিকল্প অনুবাদ—যা আমার গুরু স্বামী বিবেকানন্দই করেছিলেন—ব্যবহার করেছি।"[৪৯] 'নোটস অন সাম ওয়ান্ডারিংস' মধ্যে স্বামীজীর মুখে গানটি দু'বার ব্যবহারের উল্লেখ আছে (কমপ্লিট ওয়ার্কস—১ খণ্ড পৃঃ ২৮৭ ও ৩১০)। নিবেদিতা পরবর্তীকালে বিন্যাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন এবং ভাষাগত সামান্য পরিবর্তনও চোখে পড়ে। সুতরাং স্বামীজীর মুখে শোনা অনুবাদের সঙ্গে নিবেদিতার নিজস্বতাও আত্মগোপন করে আছে, তবে সেগুলি সর্বত্র চিহ্নিত করা বর্তমানে অসম্ভব।

বাংলা কাব্য থেকে তাঁর অনুবাদও বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুশয্যার বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের প্রার্থনামন্ত্রটির স্বকৃত অনুবাদ তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে শোনানো হতো সেটি ছিল তাঁর শেষজীবনের সঙ্গী।

শ্রীমতী লঙফেলোর পত্রে জানা যায় শ্রীমতী বুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আমেরিকা পরিত্যাগকালে জাহাজ থেকে বিদায়বাণী আবৃত্তি করেছিলেন এই বন্ধনহীন মুক্ত আত্মার চিরন্তন প্রার্থনায় :

"In the East and in the West
In the North and in the South
Let all these that are,
Without enemies, without obstacles
Having no sorrow and attaining cheerfulness
Move forward freely
Each in his own path"[৫০]

(পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে—সকল প্রাণী, যারা শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তারা অবাধগতিতে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হোক)।

ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যুক্ত ভাবপ্রবাহ নিবেদিতার মনোজগতকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাঁর রচিত সাহিত্যে এই দুয়ের মেলবন্ধন সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তীজীবনে অর্থাৎ স্বামীজী-সান্নিধ্যে আসার পর তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিশেষ করে সেই অংশগুলির প্রতি বেশি মনোযোগী যেগুলি ভারতবর্ষ ও ভারতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যে রচনাগুলিতে অধ্যাত্মচেতনা বা সত্যানুসন্ধানের একটি নিরপেক্ষ চিন্তা উদ্ভাসিত, যেগুলিতে ভারতের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশ বা রূপায়ন জাতিবিদ্বেষের সঙ্কীর্ণতায় খণ্ডিত নয়। অবশ্য যেখানে এই জাতিবিদ্বেষ কোনোভাবে ভারতবর্ষকে জগত সমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করেছে সেখানে তাঁর লেখনী অসির মতো ঝলসে উঠেছে—প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নির্মম কঠোরতা।

তাঁর পত্রাবলীতে বিভিন্ন লেখকের রচনার সঙ্গে যে সংযোগের বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখি এমার্সনের রচনার সঙ্গে তাঁর কৈশোরপরিচয় কোনোদিন ম্লান হয় নি। নিবেদিতার উৎসাহেই স্বামী সদানন্দ এমার্সন পড়েছেন।[৫১] নাটক ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণের

কথা আমরা আগেই জেনেছি। শেক্সপীয়র তাঁর প্রিয় নাট্যকার—গ্রীক নাটকের সঙ্গেও ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আদর্শ নারী চরিত্র রচনায় ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে শেক্সপীয়র ও গ্রীক নাটক প্রসঙ্গ এসেছে একদিনের একটি ঘটনায়। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে সেদিনের বিবরণ জানিয়েছেন একটি পত্রে। স্বামীজী রামায়ণ কাহিনী শোনাচ্ছিলেন—লঙ্কাযুদ্ধ পরিসমাপ্ত, মন্দোদরী আসছেন রামচন্দ্র সকাশে। রামচন্দ্র ও তাঁর অনুচরবর্গ অপেক্ষা করে আছেন এক মহান সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। সকলকে বিস্মিত করে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন রাবণবনিতা, অতি সাধারণ সদ্যবিধবার আবরণে আবৃত এক শোকাচ্ছন্ন নারীমূর্তি। 'কে এই নারী'—বিস্মিত রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন বিভীষণকে। উত্তরে বিভীষণ বললেন, 'মহারাজ ইনিই সেই সিংহিনী যাঁর সিংহ এবং শাবকগুলিকে আপনি অপহরণ করেছেন।' নিবেদিতা লিখেছেন, "আঃ য়ুম,—স্বামীজীর ধারণায় নারীর আদর্শ কি মহান। শেক্সপীয়র কিংবা এস্কেলাস যখন অ্যান্টিগোন লিখেছিলেন অথবা সোফোক্লিশ যখন এলসেসটিস গড়েছিলেন—কেউই এই রকম মহৎ নারী আদর্শের কল্পনাও করতে পারেন নি। স্বামীজী যে-সব জিনিস বলেন সেগুলি আমি যখন পড়ি তখন উপলব্ধি করতে পারি যে এটা—এর প্রতিটি শব্দ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নারীত্বের দিগদর্শন।"[৫২]

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সম্পদ সম্পর্কে নিবেদিতা যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি তার উন্নতির জন্য তাঁর উৎসাহও ছিল অসাধারণ। স্যার ফ্রাঙ্ক রবার্ট বেনসন সমকালে শেক্সপীরিয় অভিনয়কলার একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ, নাট্যপরিচালক এবং অভিনেতা। ভারতীয় নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের কথা জানতে পেরে নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহী করে তোলার জন্য একটি পত্র দেন। পত্রখানিতে যেমন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের নিবেদিতাকৃত মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে—তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের সমুন্নতিতে তাঁর প্রবল আগ্রহের পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়েছে। নিবেদিতা বেনসনকে লিখেছিলেন:

"ইংলণ্ডে নাটকের ক্ষেত্রে আপনার কার্যাবলী আপনাকে জাতীয় সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রচলিত লৌকিকতা বাদ দিয়ে আমার নিবেদন সরাসরি আপনার কাছে উপস্থিত করাই যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া আমি মিঃ লার্জ এবং শ্রীমতী ম্যাকলাউডের কাছে জেনেছি, আপনি ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন এবং এমন অনেক সংবাদ পাচ্ছেন যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুটি কারণই আমার পত্র প্রেরণের কৈফিয়ৎ।"[৫৩]

বেনসনের কাছে এই পত্র লেখার দুমাস আগে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, "আমি মিঃ লার্জকে পরামর্শ দিয়েছিলাম 'ক্র্যাডল টেলস' পড়তে এবং নল-দময়ন্তীর কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে—সেটা তাঁর মনে আছে তো?"[৫৪]

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে নিবেদিতা বেনসনের কাছে পাঠিয়েছিলেন উইলিয়াম জোন্সের 'শকুন্তলা'র অনুবাদ এবং সম্ভাব্য নাট্যকাহিনী হিসাবে নিজের লেখা 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম'। 'ক্র্যাডল টেলস'-এর 'নল-দময়ন্তী' কাহিনীর প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় নাটকের মঞ্চ-উপস্থাপনার অসুবিধা উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, অলঙ্কার এবং পোশাকের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করেছেন কারণ এগুলির উপর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "খাঁটি ভারতীয় নাটক এই দেশের দুই বিশাল মহাকাব্য থেকে উদ্ভূত, অল্পবিস্তর পূর্বপ্রস্তুতিহীন রচনা যা প্রাচীন ঐতিহ্য অবলম্বনে অনুভূতিপ্রবণ কবি, অভিনেতা এবং আবৃত্তিকারের দ্বারা রচিত।

"এই দেশটি এখনও, যখন গ্রামের সব কিছু নিঃশেষিতপ্রায়, নাটকীয় অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু এগুলি 'অকেসিন ও নিকোলিট'[৫৫] ধরনের রচনা যাতে একদল গাইয়ে গান গেয়ে বা কথা বলে কাহিনী বর্ণনা করে যায়।" এর নিদর্শন হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন 'নল-দময়ন্তী'র অন্তর্গত ঘটনাটি যেখানে নলকর্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণ

দময়ন্তী সমীপে উপস্থিত হয়ে সংগীত সাহায্যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

শকুন্তলা নাটক মঞ্চে উপস্থাপনার অন্তরায় ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইত্যাদি ছাড়াও 'শকুন্তলা' নাটকের আরও একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো, জোন্সের নাটকটি "rather long—winded and heavy". ভারতীয় নাটক পাশ্চাত্ত্য জগতে উপস্থিত করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো "Nor is it easy for us to feel the charm of characters moulded on Social demands so different from our own."

'ক্র্যাডল টেলস'-এর মধ্যে রামায়ণ কাহিনীর এবং ভারতীয় আদর্শবাদের প্রতি বেনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "The Ramayana has been prolific of dramatic versions. I do not know whether my book will give you any hint of a fact that to my mind baffles expression, the exquisite beauty of Indian idealism."

এই আদর্শবাদের মধ্যেই যে নাট্যরসের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা নিবেদিতার দৃষ্টি এড়ায় নি। বেনসনকে সে সম্পর্কে সচেতন করে লিখেছেন, "ভারতের মানুষ সেই ফ্রান্সিসের মতো দারিদ্র্যকে আদর্শায়িত করতে পারে এবং আমার মতে, এর মধ্যে রয়েছে কাব্য ও নাট্যরসের অফুরন্ত উৎস।"

এই চিঠিতে নিবেদিতা 'নল-দময়ন্তী' সম্পর্কেই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করলেও আর একটি কাহিনীর নাট্টিক সম্ভাবনার কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। তাঁর মতে গিলবার্ট মারেকে[৫৬] দিয়ে লেখানো সম্ভব হলে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো নাটক রচনার উপযুক্ত উপাদানও এখানে আছে। গ্রীক ট্র্যাজেডি 'ট্রোজান ওম্যান'[৫৭]-এর অনুসরণে 'দি ওম্যান অব চিতোর' অবশ্যই সফল হবে। নিবেদিতা চিতোরের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "পর্বতশীর্ষে অবস্থিত চিতোর একটি অপূর্বসুন্দর দুর্গনগরী। ওয়াল্টার স্কটের মতো কেউ সে নগরের সৌন্দর্য বর্ণনায় সক্ষম। ট্রয়ের

মতো চিতোরেরও পতন হয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীরা শপথ দিয়ে গৈরিক বস্ত্র পরে যুদ্ধে যেত—আর সেখানকার নিয়ম ছিল যুদ্ধে প্রাণদান—যাকে বলা হতো বীরসন্ন্যাস। নারীরা নগর-প্রাকারে উঠে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।…পদ্মিনী ছিলেন প্রধানা সম্রাজ্ঞী। তাঁর রূপের খ্যাতিই মুসলমানগণ কর্তৃক চিতোর আক্রমণের কারণ। তাঁকে মাঝে মাঝে ভারতের হেলেন বলে উল্লেখ করা হয়—কিন্তু হেলেনের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য।" ভারতীয় ও গ্রীক জীবন দৃষ্টির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "যিনি হেক্টরের (স্বামী) জন্য বিলাপ আর্তনাদে মুখর অবস্থায় নিজ সন্তানকে হত্যার জন্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই আন্দ্রোমাথে।[৫৮] যত সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় হোন না কেন ভারতীয় প্রতিভার চিন্তায় অকল্পনীয় এবং ঘৃণিত। The Greek seems to have been hampered by his belief in death. The Indian has always defied it."

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি টডের 'অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যানটিকুইটিজ অব রাজস্থান' নিবেদিতার একান্ত প্রিয় গ্রন্থ। বার বার পড়েছেন বইটি। চিকাগো থেকে ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে লিখছেন, "টড আবার পড়ছি…ভারতীয় সাহিত্যের এই উপভোগ যদি তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতাম।"[৫৯]

'রাজস্থান' পড়তে পড়তে নিবেদিতা বার বার ভারতীয় শৌর্য-সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার নানা নিদর্শনে মুগ্ধ হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তার নাটকীয় সম্ভাবনার দিকটিও তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানেই সাক্ষাৎ পেয়েছেন কৃষ্ণশরণাগতা মীরাবাঈয়ের, সংগ্রামরত রাণা প্রতাপের এবং আত্মবিসর্জনের মহিমায় ভাস্বর কৃষ্ণকুমারীর যিনি তাঁর কাছে 'আধুনিক ইফিজেনিয়া'।[৬০]

নিবেদিতা বেনসনের কাছে লেখা পত্র শেষ করেছেন ভারতীয় নাট্য-কাহিনীর সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে, "আমি জানি না, আমার এই 'সাজেশান' থেকে আপনি কিছু পাবেন কি না কিন্তু আমার কামনা আপনি কিছু পান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন,

যিনি এর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করবেন, এমন কেউ একজন 'ওম্যান অব চিতোর' নিশ্চয় লিখবেন।"

বেনসনের কাছে নিবেদিতার চিঠি পৌঁছেছিল কিন্তু তাঁর প্রেরিত উপহার (যার মধ্যে ছিল 'শকুন্তলা' ও 'ক্র্যাডেল টেলস') তাঁর জীবিতকালে পৌঁছয় নি, পরে পৌঁছেছিল কি না বলা শক্ত। ১৯১১ সালের ৩ নভেম্বর ম্যাকলাউড একটি চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন :

"বইয়ের প্যাকেটটি বেনসনের কাছে প্রেরিত মার্গটের উপহার। সুতরাং আর কিছুদিন এটি সতর্কতার সঙ্গে রেখে দিন। সে আমাকে ৭ সেপ্টেম্বর শেষ চিঠি লেখার আগে[৬১] বেনসনকে তিন পৃষ্ঠা চিঠি দিয়েছে।

"আজ দার্জিলিঙ থেকে ডক্টর বোসের ১০ অক্টোবরের চিঠি পেলাম। তাতে বলা হয়েছে মার্গট গুরুতর অসুস্থ, তার জন্য প্রার্থনা জানাতে। তারপর তিনদিনের মধ্যেই সে চলে গেছে।"[৬২]

শুধু ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের গৌরব ঘোষণা এবং বাইরের জগতে তাকে পরিচিত করে তোলার প্রচেষ্টাই নয়, তার সমৃদ্ধির জন্য নিবেদিতার সক্রিয়তাও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিবেদিতা ইবসেনের অনুরাগিণী। পত্রাবলীর মধ্যে ইবসেন পাঠের কথা অনেক-স্থানেই চোখে পড়ে। কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁর মনে যখন অবসাদ এসেছে—ভারতের উন্নতির পথে নানা প্রতিকূলতা যখন হতাশা জাগিয়ে তুলেছে তখন টেনে নিয়েছেন ইবসেনের নাটক। শ্রীমতী বুলকে লিখেছেন, "কয়েক মিনিট, না একঘণ্টা আগে আমি ভারত ও পৃথিবী সম্পর্কে এত হতাশা বোধ করেছিলাম যে শুয়ে শুয়ে 'মাস্টার বিল্ডার' পড়ছিলাম।" নৈরাশ্যের মুহূর্তের 'মাস্টার বিল্ডার'-এর নায়কের ট্র্যাজেডি হয়ত তাঁর ভাল লেগেছিল কিন্তু মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে নিবেদিতা আবার "Like a giant refreshed with wine."[৬৩]

সেই ইবসেনের রচনার সঙ্গে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতাই। ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকটি গিরিশচন্দ্রকে পড়তে দিয়েছিলেন তিনি। নাটকটি পড়ে উভয়েই অভিভূত। তারপর

গিরিশচন্দ্রই নিবেদিতার জন্য 'মাস্টার বিল্ডার' সংগ্রহ করে আনেন। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের একটু ইতিহাস আছে, সেটা এ প্রসঙ্গে জানানো প্রয়োজন। ১৮৬৬ সালে 'ব্র্যাণ্ড' নাটক প্রকাশের পূর্বে ইবসেন ১০ খানি নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু কোনোটিতেই সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। স্বভাবতই নাট্যকারের জীবনে তখন চরম নৈরাশ্য। জীর্ণ পোশাকপরা হতশ্রী চেহারার ইবসেনকে দেখে কেউ তখন কল্পনাও করতে পারতেন না যে ইনিই পরবর্তীকালে একজন পৃথিবী-বিখ্যাত নাট্যকার হয়ে উঠবেন। হতাশা-ক্লান্ত, অর্থাভাব-জর্জরিত মাতাল ইবসেন তখন নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু হঠাৎই সব ওলোটপালট হয়ে গেল। তাঁর জীবনীকার কোঅট (Koht) লিখেছেন:

"Sales of this book (Brand) surpassed the wildest hopes. His personal appearance underwent an immediate and striking transformation……he even changed his handwriting. He was a new man."[৬৪]

দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য এই নাটকটি উল্লেখযোগ্য তা হলো এই নাটক রচনার পশ্চাতে নাট্যকারের প্রেরণা, "১৮৬৪ সালে ডেনমার্ক প্রুশিয়া কর্তৃক যখন আক্রান্ত হয় তখন নরওয়ে ও সুইডেন তার সাহায্যার্থে এগিয়ে যেতে পারল না—এই অক্ষমতা জনিত লজ্জা ও ক্রোধই নাটকটি রচনার উৎস।"[৬৫] এই পটভূমিকায় আত্মত্যাগের নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন রচনাটিকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নাটক হিসাবে পরিচিত করেছিল এবং এই কারণেই নিবেদিতা নাটকটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য—সেটাই ছিল তাঁর অভিভূত হওয়ার কারণ।

'ব্র্যাণ্ডে'র সমগোত্রীয় নাটক "পীয়র জায়েণ্ট" কিন্তু নিবেদিতা পছন্দ করতে পারেন নি। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে লিখেছেন, "দেখতে পাচ্ছি, ইবসেনের 'পীয়র জায়েণ্ট' এবং তার কুমারী

মেয়েটির কাহিনী নিছক অলীক। ম্যাকডালেনের খ্রীষ্টিয় কাহিনী সত্য। মানুষের অভ্যন্তরে যতক্ষণ না আত্মানুসন্ধান ও আত্মবুভুক্ষা দেখা দিচ্ছে, যতক্ষণ না আত্মার অতৃপ্তি জন্ম নিচ্ছে, সত্তার গভীরে 'অহং' বোধের অতিরিক্ত কোনো চেতনা জাগ্রত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির কোনো উপায় নেই।"[৬৬]

গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রবন্ধে। তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিশাল ও বিচিত্র। সমকালীন রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, অধ্যাত্মবাদ থেকে শুরু করে স্টিলম্যানের লেখা কাঠ-বেড়াল সংক্রান্ত জীবতাত্ত্বিক গ্রন্থ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আনিয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন সময় পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে গ্রন্থের যে-সব ফরমায়েজ দিয়েছেন তার মধ্যে কতকগুলি—লুবকির হিস্ট্রি অব আর্ট, ফার্গুসনের ভারতীয় স্থাপত্য, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও হাণ্টার-এর উড়িষ্যা সংক্রান্ত রচনা, লেকি ও বাক্‌ল-এর ইতিহাস সংক্রান্ত রচনা, বুচার এবং ল্যাঙ-এর হোমারের রচনার গদ্যসংস্করণ, দান্তের রচনার গদ্যসংস্করণ ইত্যাদি। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে মার্তেন মার্তেনের লেখা বই যে ভারতে পাওয়া যায় সেই সংবাদ দিতে দেখি শ্রীমতী বুলকে।[৬৭]

তবে গল্প উপন্যাসে যেখানে বিষয়বস্তু 'ভারতবর্ষ' নিবেদিতার সে রচনা অবশ্যপাঠ্য, যেমন এফ. এ. স্টিলের রচনা। শ্রীমতী ফ্লোরা এ্যানি স্টিল বিবাহের পর ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত সময় ভারত-বর্ষে অতিবাহিত করেন। তাঁর 'ফ্লাওয়ার অব ফরগিভ্‌নেস' অমরনাথের পটভূমিকায় রচিত এবং নিবেদিতা সেই কারণেই আকর্ষণ বোধ করছেন কিন্তু বইটি তাঁকে বিশেষ খুশি করতে পারে নি। শ্রীমতী বুলকে একটি পত্রে জানিয়েছেন যে লেখিকা সম্ভবত ইসলামাবাদের পর আর এগোন নি—তবে কয়েকটি গল্প তাঁর ভাল লেগেছিল।[৬৮] এই চিঠিতেই হামফ্রে ওয়ার্ডের রচনা পাঠ করার কথাও জানিয়েছেন। আর একজন গল্প লেখক রিচার্ড বার্টন সরকারী কাজ নিয়ে এদেশে এসেছিলেন এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ইনি পর্যটক হিসাবে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন ছদ্মবেশে মক্কা পর্যটন করে।

নিবেদিতা বার্টনের 'বিক্রম এ্যাণ্ড দি ভ্যাম্পায়ার' বইটি পাঠ করে কৌতুক বোধ করেছিলেন। বাইরে থেকে যে সব বই আনিয়েছিলেন তার মধ্যে গল্প উপন্যাস প্রায় অনুপস্থিত, তবে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক গল্প শোনা, পড়া বা লেখায় তাঁর উৎসাহে কখনও মন্দা দেখা দেয় নি।

অপরপক্ষে কাব্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক প্রবল। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল (সমসাময়িক) পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবির কবিতাই তাঁর রচনায় স্থানে স্থানে উদ্ধৃত, তবে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখি হুইটম্যান, রসেটি, জর্নসন, জর্জ এলিয়ট, ব্লেক, রবার্ট বার্নস ও লাওয়েলের প্রতি। ব্রাউনিঙ-এর একটি পঙক্তি "God is in His Heaven—all is right with the world" স্বভাবতই তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করেছে। লিখেছেন, 'I have always particularly disliked this verse of Browning',[৬৮] উইলিয়ম মরিসের 'নর্স-সাগা'-গুলি নিবেদিতা সংগ্রহ করেছিলেন বিদেশ থেকে। 'নর্স-সাগা'র একটি অংশ বংশপরম্পরায় প্রচলিত মৌখিক কাব্য যা অনেক পরে লিখিত রূপ পায়। এগুলি মূলত রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস যার মধ্যে জীবনকাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি—আইসল্যাণ্ডীয় 'সাগা'—আইসল্যাণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী। 'সাগা'-র সর্বশেষ অংশটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত বলে অনুমিত হয়। মরিসের 'নর্স-সাগা'-গুলি 'ওয়েভ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' রচনায় নিবেদিতাকে সহায়তা করেছিল—তা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন নিজের গ্রন্থে।[৬৯]

নিবেদিতার মৌলিক রচনাগুলি চরিত্র বিচারে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এর অংশকে 'সংগ্রাম' এবং অপর অংশকে 'শান্তি' রূপে অভিহিত করতে পারি। প্রথম অংশে ঘটেছে মনোজগতকে অবলম্বন করে বস্তুজগতের উদ্‌ঘাটন এবং দ্বিতীয় অংশে বস্তুজগতকে অবলম্বন করে মনোজগতের উন্মোচন। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নিবেদিতার রচনার বড় অংশ সংগ্রামের অস্ত্ররূপে। সে সংগ্রাম খ্রীষ্টান মিশনারীদের

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, বিদেশে ভারতকে অবজ্ঞার বিরুদ্ধে, স্বদেশে (ভারতে) বিদেশী ভাবধারার অকল্যাণকর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, বিদেশী শাসকের অবিচার এবং শক্তি আস্ফালনের বিরুদ্ধে। নিবেদিতা দেশে বিদেশে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বিদেশী শোষণ, প্রচ্ছন্ন ও লুপ্ত সম্পদ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প—সর্বক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক অতীত এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করেছেন তিনি এবং সেই সঙ্গে বিদেশী শাসকের অপকৌশলে ভারত সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য যে কতখানি সঙ্কুচিত তা উদ্‌ঘাটন করেছেন। বিদেশীর সহানুভূতি বা অনুকম্পায় নয়, ভারতকে তিনি দেখেছেন স্বদেশবাসীর বেদনার্ত চিত্ত দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন "নিবেদিতা আদর্শবাদী বলেই আরও অন্যান্য বিদেশীর চেয়ে অনেক বেশি দেখেছেন কারণ তাঁরা শুধু বস্তুকেই দেখেন, সত্যকে নয়।"[৭০] একজন সাধারণ বিদেশীর দৃষ্টি তার ব্যক্তিগত বা জাতীয় স্বার্থবোধে অস্বচ্ছ কিন্তু নিবেদিতা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। সুতরাং সাধারণ বিদেশীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য শুধু আদর্শবাদের উদারতার জন্য নয়। নিবেদিতা প্রকৃত অর্থেই ভারতবাসী—যে কোনোও ভারতবাসার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই ভারত-বাসী। সেই পরিচয়ই তাঁর রচনাবলীতে নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমার মতে, নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব, তাঁর প্রকাশভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে তাঁর গভীর বিশ্বাস। সেই সর্বব্যাপী বিশ্বাসকে তিনি নিজের শোণিতবিন্দুর সঙ্গে সংমিশ্রিত করতে পেরেছিলেন, যা একজন সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী লিখেছেন, "কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই ; যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছেন তাঁহার সত্তা তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া যায়, তাই কথায় জোর হয়। যে ব্যক্তি নিজের কথা-গুলিতে নিজের সত্তা, নিজ জীবন প্রদান করিতে পারেন তাঁহারই কথায় ফল হয়।" স্বামীজীর এই কথার বড় উদাহরণ তাঁর শিষ্যা ভগিনী

নিবেদিতা।

নিবেদিতার রচনাবলী তাঁর চরিত্রেরই একটা অংশ। তাঁর জীবনীরচয়িত্রী শ্রীমতী বারবারা ফক্স লিখেছেন, "If she had been more discriminating, more cautious and a little less emotional, she might have been a better writer, but on the otherhand, she might not have been waded out into floods to feed the famine victims or held in her arms children dying of the plague."[৭১]

যে তীব্র আবেগে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই আবেগই তাঁর রচনায় সঞ্চারিত। নিবেদিতার সাহিত্যপাঠের পরিধির মধ্যে উপন্যাস-গল্পের আপেক্ষিক অনুপস্থিতি এবং কাব্য-নাটকের প্রতি আকর্ষণের কথা আগেই জানিয়েছি। কাব্য-নাটকের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং রোমান্টিক রচনার প্রতি আকর্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। এর অর্থ এই নয় যে নিবেদিতা জগতের বাস্তবতা থেকে পলায়ন করতে চেয়েছেন—তাঁর সংগ্রামী সাহিত্যের দিকে তাকালে বোঝা যায়, জগতের ক্লেদ, গ্লানি, দুঃখকে কত তীব্রভাবে স্বীকার করেছেন এবং তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন কিন্তু সেই বাস্তবতার ঊর্ধ্বে আদর্শায়িত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এক বর্ণাঢ্য স্বপ্নকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

১৯০০ সালে প্রকাশিত 'কালী দি মাদার' গুরু বিবেকানন্দের শিষ্যার যোগ্য রচনা। ভারতীয় জীবনে এটিকেই নিবেদিতার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলা যেতে পারে যদিও এর আগেই এলবার্ট হলে প্রদত্ত কালী-বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল পুস্তিকাকারে। সেটি বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ মাত্র। এই প্রথম একজন বিদেশী মহিলা ভক্তের শরণাগতি নিয়ে তাকিয়েছেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের বহু আক্রমণের লক্ষ্য কালী-মূর্তির দিকে। সেই মূর্তিতে দেখেছেন ভয়ঙ্কর ও কল্যাণসুন্দর ভাবের সমন্বয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনই ঈশ্বরের প্রতীক কল্পনার উৎস। রুক্ষ মরু-ভূমির আরবদের কাছে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রচলিত, ঈশ্বর

পিতা। আর্যভূমিতে নারীর স্থান সর্বোচ্চে। পশ্চিমে স্ত্রী স্বামীর কাছে সম্রাজ্ঞী আর প্রাচ্যে জননী তার সন্তানের আরাধনায় ঈশ্বরী। ভারতে এই মাতৃরূপের সাধনা কিন্তু মাতৃরূপা কালীর ভয়ঙ্করী রূপ—বিবসনা, আলুলায়িত কুন্তলা, গাত্রবর্ণের গাঢ় নীলিমার মসীবর্ণ প্রতিভাত, দু-হাতে আশীর্বাদ অন্য দুটি হাতে অসি এবং রক্তঝরা মানবমুণ্ড! পশ্চিমবাসীর কাছে এ মূর্তি বীভৎস বলে মনে হতে পারে—কিন্তু ভারতে তিনিই অন্তর অধিকার করে আছেন। নিবেদিতা বলেছেন, যাঁরা তাঁকে ভয়ঙ্করীরূপে দর্শন করেন তাঁরা ক্ষমার্হ। প্রকৃতপক্ষে সকল নারীর মধ্যে ভারতবর্ষ সেই শক্তিরূপিনীকেই দর্শন করে। "কালী দি মাদার" গ্রন্থে দুই মাতৃসাধক—রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের যে চরিত্রচিত্র স্থান পেয়েছে, তাতে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দুই ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত ও উদ্‌ঘাটিত। রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভূমিকা স্বরূপ—"রামপ্রসাদ…জগন্মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসার ভাষ্যকার, রামকৃষ্ণ…সন্তানের জন্য পরমমাতৃচৈতন্যের পূর্ণাবতার।" প্রবন্ধে জগন্মাতা এবং তাঁর দুই সাধক-পুত্রের জীবন নতুন আলোকে নিবেদিতার সমুজ্জ্বল।

বিদেশে ভারতের জীবন-সত্য উদ্‌ঘাটিত করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হাতে তৈরী ভারতসম্বন্ধীয় ধারণাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন নিবেদিতা তাঁর 'ওয়েভ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে। ১৯০১ সালে নরওয়ে থেকে একটি পত্রে তাঁর এই প্রবন্ধগ্রন্থ আরম্ভের সংবাদ দিয়েছেন শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে, "বর্তমানে আমি শ্রীদত্তের (রমেশচন্দ্র) ইচ্ছামত বইটি রচনা করছি। এ পর্যন্ত 'হিন্দু ওম্যান অ্যাজ ওয়াইফ' এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর রচনা শেষ করেছি।" এই পত্রের মধ্যেই দেখা যায় বইটি রচনার পটভূমিকা-পরিচয়। নিবেদিতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যাবতীয় পাপের জন্য নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করতে অগ্রসর হয়েছেন "Oh! India! India! Who shall undo this awful doing of my nation to you? Who shall atone for one of the million bitter insults showered daily on the bravest

and the keenest, nerved and best of all your sons ?[৭২] দীর্ঘ তিন বছর পরে বই শেষ করে সংবাদ দিচ্ছেন বান্ধবীকে "তোমার খুকী তার বই শেষ করেছে···পরশু ৭ তারিখে বেলা ৪টায় বই শেষ হয়েছে এবং শেষ যে অধ্যায়টি লেখায় ব্যাপৃত ছিলাম সেটি হল শিব সম্পর্কে।"[৭৩]

১৯০৪ সালে 'ওয়েভ' মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলো। ৩০ জুন শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখলেন, "জানো নিশ্চয়' আমার বই বেরিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তুমি বুঝতে পারছ এ বই প্রকৃত-পক্ষে তাঁরই (স্বামীজীর) লেখা।···যাই হোক, আমি স্বামীজীর নামে আশা করছি বইটি (১) ভারতে নারী মিশনারী পাঠানো বন্ধ করবে (২) ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান ঘটাবে এবং যেটা আমার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য (৩) ভারতকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিন্তা করতে শেখাবে।"[৭৪]

'ভারতীয় জীবনের ঢেউ' সমালোচক মহলে তুফান তুলল। স্বার্থান্বেষী মহলের আর্তনাদে মুখর হলো সাহিত্যের অঙ্গন। ১৯০৪ সালের ৯ আগষ্ট 'দি চার্চ টাইমস' লিখল, "(এই পুস্তকে) ভারতীয় জীবন-চিত্রের অন্য দিকটা চেপে রাখা হয়েছে, আমরা তার বিরোধিতা করি, শুধুমাত্র সত্যের মুখ চেয়ে নয়, এর দ্বারা নারীসমাজের ক্ষতির সম্ভাবনায়। এই ধরনের আবেগপ্রবণ আদর্শবাদের যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে তাদের (নারীদের) ভাগ্য কোনো দিনই ফিরবে না। ভারতীয় নারীসমাজে অন্তর্নিহিত শক্তির অস্তিত্ব আমরা বিশ্বাস করতে রাজি আছি কিন্তু সেই আদর্শে পৌঁছবার জন্য ভারতের মানুষের ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় বিধানসমূহ ও রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং খ্রীষ্টধর্মই সে পরিবর্তন আনতে পারে।"[৭৫]

এ্যাথেনিয়াম পত্রিকায় (১৯০৪) লেখা হলো : "সামাজিক ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতা পথপ্রদর্শক হিসাবে বিশ্বাসের অযোগ্য কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা আরও অনেক কম। দুঃখের কথা তাঁর ধারে কাছে এমন কোনো পণ্ডিতবন্ধু ছিলেন না যিনি তাঁকে 'ইণ্ডিয়ান সাগা' (**Indian Saga**) বা 'সিনথিসিস অব

ইণ্ডিয়ান থট'-এর মতো অধ্যায়গুলি ছাপাতে নিষেধ করতে পারতেন। এই ধরনের ভুল বোঝা ও ভুল ব্যাখ্যার নজির দেখানো খুব সোজা কিন্তু তার চেয়েও সেটা অনেক বেশি অরুচিকর।"৭৬

অবশ্য প্রশংসারও অভাব ঘটল না। 'কুইন' পত্রিকায় সমালোচক লিখলেন (২৪. ৮. ১৯০৪) : "মানুষকে বোঝার প্রাথমিক গুণ যদি ভালবাসা হয় তাহলে বলতেই হবে লেখিকা সেই গুণের যথার্থ অধিকারী কারণ তিনি প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে সেইভাবে লিখেছেন যেভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদ সম্পর্কে লেখে।...যাঁরা, পূর্বসিদ্ধান্তনিপুণ, সহানুভূতিহীন মিশনারীদের বা পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য রচনা পাঠ করে অথবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কচকচি থেকে ভারত সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলেন, তাঁরা এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ মাধুর্যমণ্ডিত গ্রন্থ থেকে নিজেদের ধারণার সংশোধন করে নিলে ভাল হয়।"৭৭

ডেট্রয়েট ফি প্রেস (২৪.৭.১৯০৪) লিখলেন, "সাধারণত পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভারতীয় নারীর পরিচয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাক্ষ্যের মারফৎ। সেই কারণে কয়েকদিন পূর্বে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সিস্টার নিবেদিতার 'দি ওয়েভ অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ' এক নবদিগন্তের উন্মোচন। গ্রন্থটি অতি দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং এটি যুগান্তকারী গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।"৭৮

সমালোচনা, ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন নিবেদিতা তার জন্য আদৌ বিচলিত নন, তিনি লিখেছেন অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপ। ম্যাকলাউড-কে লিখেছেন, "যদি তুমি গভীরভাবে এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্বামীজীকে খুঁজে পাও তবেই আমাকে সবচেয়ে তৃপ্তি দেবে। আমি অন্যের হাতে যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছি—তিনিই (স্বামীজী) চেয়েছিলেন আমার সমগ্র অন্তর, মস্তিষ্ক ও সত্তাকে তাঁর কাজে ব্যবহার করতে।"৭৯

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'এ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অব লাভ এ্যাণ্ড ডেথ'। আকারে ক্ষুদ্র হলেও নিবেদিতা-সাহিত্যে এটি অভিনব সংযোজন। উপহার অংশে পাই 'Because of Sorrow'. এই

বইটিতে নিবেদিতা তাঁর যোদ্ধবেশ পরিত্যাগ করে নম্র পূজারিণীর বেশে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং নিঃসঙ্কোচে আপনার ব্যক্তিগত বেদনাকে উম্মোচিত করেছেন। স্বামীজীর তিরোভাব বইটির পটভূমি। প্রেম ও মৃত্যু সম্পর্কিত ভারতীয় সাহিত্যের মণিমুক্তা উদ্ধার করে উপস্থিত করেছেন তিনি এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর শরণাগতির প্রার্থনা মন্ত্র :

O Krishna, Thou loving shephard of the people
Buddha, Lord of infinite compassion
Jesus, Thou lover and saviour of the soul
Ramkrishna, Thou face of the Divine Mother
Vivekananda, of the mighty heart
Receive her in Thine own presence, O Lord God,
And let light perpetual shine upon her.[৮৩]

এই রচনার কাব্যসুষমামণ্ডিত গদ্যের অনুপম নিদর্শন নিবেদিতার দার্শনিক ও কবিচিত্তের পরিচয়বাহী।

এই রচনা ছাড়াও নিবেদিতার কাব্যভাবনার এক বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে ভারতীয় মৃত্যুচেতনার দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধির পরিচয়। বলা বাহুল্য মৃত্যু সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা স্বামীজীর চিন্তা-অনুসারী। পাশ্চাত্ত্য জগৎ মনে করে মানুষ একটি দেহ যার আত্মা আছে, অপর-পক্ষে ভারতীয় ধারণায় মানুষ আত্মা যা দেহধারণ করে। যখনই সে দেহ জীর্ণ হয় তখনই আত্মা নতুন দেহ গ্রহণের জন্য পুরাতনকে পরিত্যাগ করে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের জন্য পাশ্চাত্ত্য জগৎ মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর সমাপ্তিরূপে কল্পনা করে আর প্রাচ্য জগৎ মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভয়, কেন না আত্মা অমর। নিবেদিতা তাঁর 'ওয়েভ অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ'-এর অন্তর্গত 'দি হুইল অফ বার্থ এ্যাণ্ড ডেথ' শুরু করেছেন তিনটি উদ্ধৃতি দিয়ে। প্রথমটি গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদেসের 'আলসেসটিস'-থেকে :
Reflection has taught me that there is nothing mightier than destiny···'Zeus bows to her power' আর

শেষ করেছেন ভগবদ্‌গীতার সেই ‘বাসাংসি জীর্ণানি’ শ্লোকটি দিয়ে। মধ্যবর্তী উদ্ধৃতিটি জর্নসনের : Heredity is a condition, not a destiny.

তিনি ‘বিউটিস অব ইসলাম’ রচনার মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কিত একটি আরবি কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, “Take thou thy way by the grave wherin thy dear one lies.”[৮১] মৃত্যুর রহস্যময়তা, আত্মার ক্রন্দন চিত্তস্পর্শী সন্দেহ নেই কিন্তু নিবেদিতা মৃত্যুকে দেখেছেন শক্তিস্বরূপিনী কালীর ভক্তরূপে, তাই উপসংহারে উপস্থিত করেছেন হুইটম্যানের ‘When the Lilacs last in the Dooryard Bloomed’ কবিতা থেকে :

Dark Mother, always gliding near with soft feet
Have not chanted for thee a chant of fullest welcome ?
Then I chant it for thee—I glorify thee above all :
I bring thee a song, that when thou must indeed come.
Come unfalteringly
Approach, strong Deliveress !
When it is so, when thou hast take them
I joyously sing the dead
Lost in the loving floating ocean of thee
Loved in the flood of thy bliss ! O Death.[৮২]

সবশেষে নিবেদিতার মন্তব্য ‘Truly a heroic word”—মৃত্যু সম্পর্কে এই বীরোচিত ভাবনার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ।

“এ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি”-তে নিবেদিতা জীবন-মৃত্যু-আত্মার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন ভারতীয় দর্শনের আলোকে। তিনি মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন ধ্যান ও সমাধিরূপে—যখন মানুষ বস্তুজগতকে অতিক্রম করে গভীরতর মনোজগতের মধ্যে প্রবেশ করে। সে অবস্থায় জীবিত মানুষ

তার সান্ত্বনার জন্য মৃতের দৈহিক অস্তিত্বকে নিকটতরভাবে অনুভব করতে পারে কারণ আত্মার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেই, সুতরাং স্থান পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন নেই। অপরপক্ষে সেই ধ্যানের জগতে মানুষ তার খণ্ডিত সীমাকে লঙ্ঘন করে অসীমতায়—ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছতে পারে। "Death is just a withdrawal into meditation, the sinking of the stone into the well of his own being."[৮৩]

'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম' প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ের স্বাক্ষর। গ্রন্থটি ১৯০৭ প্রথম প্রকাশিত হলেও ভারতীয় পুরাণের এই চিরন্তন কাহিনীগুলি তিনি সংগ্রহ করতে শুরু করেন ১৮৯৯ সাল থেকে, বিশেষ করে পাঠশালার শিশুদের কাছে গল্প বলার প্রয়োজনে। ১৬ নভেম্বর ১৮৯৯ তারিখের পত্রে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "একটা প্রাথমিক স্কুলে আজ বিকালটা কাটবে—যেখানে বাচ্চাদের গল্প শোনাতে হবে।...আমি শিশু খ্রীষ্টের গল্প দিয়ে আরম্ভ করব স্থির করেছি, তারপর আসব ভারতীয় শিশু-খ্রীষ্ট—ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং গোপালের কাহিনীতে।" গল্পগুলি তিনি প্রথম শুনতে এবং সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন স্বামীজী, যোগীন মা'র কাছ থেকে। তারপর শুরু হয় এই ভারতীয় কাহিনীগুলিকে বিদেশের শিশুদের উপযোগী করে গ্রন্থরচনার প্রয়াস ও তথ্যসংগ্রহ। ভূমিকায় যোগীন মা'র কাছে ঋণস্বীকার করে নিবেদিতা লিখেছেন, "এই বইটি রচনার ব্যাপারে বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার সহৃদয় প্রতিবেশিনী যোগীন মা'র। পবিত্র সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান, এক তরুণ শিক্ষার্থিনীকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সদাতৎপরতার সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়।"[৮৪]

১৯১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম 'মাস্টার এ্যাজ আই স হিম' প্রকাশিত হলো। পরদিন স্বামীজীর জন্মোৎসব। একটি বই তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিবেদিতাকে দেওয়া হলো—তিনি মঠে গিয়ে স্বামীজীর ঘরে তাঁর সোফার ওপর রেখে প্রণাম

জানালেন গুরুকে। এ বই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রণাম।

প্রচলিত অর্থে 'মাস্টার'-কে জীবনীগ্রন্থ বলায় আপত্তি হতে পারে। নিবেদিতা স্বয়ং সে বিষয়ে সচেতন। বইটি প্রকাশের প্রাক্কালে শ্রীমতী বুলকে একটি পত্রে লিখেছেন, "আমার বিবেচনায় আজকাল আর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় না। ৫০ বছর পরে মর্লের 'গ্ল্যাডস্টোনের জীবনী' একটি আকর গ্রন্থরূপেই গৃহীত হবে। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আদর্শ সাহিত্যকে বিনষ্ট করেছে এবং আমরা সালতারিখের তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছি।" ১৯০৪ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন তাঁর কাছে স্বামীজীর জীবনী রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন তাঁর দ্বিধা ছিল প্রবল—"Oh, to have written the Life of Swamiji!···To be properly written Swamiji's Life should be all Swamiji. He should move through it, like JESUS through the Gospels, alone, unfettered, unshadowed. But I feel incapable of this and capable only of telling what I have seen in Him.[৮৫]

স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থ রচনায় নিবেদিতা গতানুগতিক পথ গ্রহণ করেন নি, তার কারণ তিনি নিজেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, অনুরাগ-বিরাগ—সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে দুর্লভ পরিচয় তাঁর গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তা কি অন্যত্র লভ্য? নিবেদিতা বলেছেন, জীবনীগ্রন্থে 'Life must move'—এই চলমানতা, জীবনের স্পন্দনই শুনতে পাই প্রতি পৃষ্ঠায়—জীবন সম্পর্কে লেখিকার বিশ্লেষণচাতুর্যপূর্ণ ভাষ্য নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বাঁধা ছকে জীবনীসাহিত্যের সাহিত্যমূল্য যখন নিঃশেষ হতে বসেছে তখন জীবনীরচনার এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন তিনি। এই কারণেই গ্রন্থটি সমালোচকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। 'হিবার্ট জার্নালে' বইটি সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীটি. কে. চেনি লিখে-ছিলেন, "বইখানি ধর্মীয় ক্লাসিকগুলির সমপঙক্তিতে, নানাবিধ শাস্ত্র-গুলির নিচে কিন্তু 'কনফেসনস্ অফ সেণ্ট অগাস্টাইন' এবং স্খাবাটিয়েরের

'লাইফ অব সেণ্ট ফ্রান্সিস'-এর সঙ্গে একসারিতে গৃহীত হবার যোগ্য।"[৮৬]

নিবেদিতার তিরোভাবের পর এফ. জে. আলেকজাণ্ডারের মর্মস্পর্শী শ্রদ্ধাঞ্জলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি :

"Gone now the toil which was her aspiration
Her Master's Message the whole wide world to give
The written page alone outlives the time
Her spirit's fleeing to the another world ;
But page inspired, prophetic. resonant
With all she heard and saw and loved
In the presence of the Light which was her god
Reflected in the Master As I Saw Him."[৮৭]

'নোটস অন সাম ওয়াণ্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' প্রকৃতপক্ষে 'মাস্টার'-এর পরিপূরক গ্রন্থ। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনকালে স্বামীজীর ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলাপচারি তাঁর জীবনীরই উপাদান। এই পুস্তকে নিবেদিতার অন্তর্জীবন সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'ওয়াণ্ডারিংস' ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে—নিবেদিতার তিরোভাবের পর। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'ওয়াণ্ডারিংস'-এর সংযোজন হিসাবে মূল ডায়েরীর অপ্রকাশিত কিছু অংশ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছে।

১৯১৩ সালেই নিবেদিতার 'স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' পুস্তকটিতে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বাগবাজার পল্লীতে অবস্থানকালে ভারতীয় জীবনের যে সচল রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়েছিলেন 'স্টাডিস' প্রবন্ধাবলীতে তার বিবরণী উপস্থিত করেছেন।

রচনাগুলির মধ্যে বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সামাজিক জীবনের মর্ম অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী পূজা, দুর্গাপূজা ও রাসযাত্রার মতো ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে লোক-জীবনের সম্পর্কটি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন তিনি। বাঙালীর লোকজীবন ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে নিবেদিতার উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার স্বাভাবিক কারণ জাতির মর্মমূলে প্রবেশের অধিকার লোক-জীবনের সংস্পর্শ থেকেই সম্ভব হয়। এই উৎসবগুলির সঙ্গে পৌরাণিকতার সংযোগসূত্র তিনি বিস্মৃত হন নি কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক ও প্রভাবই তাঁর মূল লক্ষ্য। নিবেদিতার এই রচনার বিশেষত্ব হলো, তিনি অতি সাধারণ এবং পরিচিত বস্তুতে আত্মগত রোমান্টিক আবেগ মিশ্রিত করে অভিনব স্বাদে পরিবেশন করেছেন।

পরিদর্শন সূত্রে ভারতের ঐতিহাসিক স্থানগুলির সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় গড়ে উঠেছিল কিন্তু সে পরিচয় কখনও বাহিরের দৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ইতিহাস ও জাতীয় চেতনা এই পরিচয়কে পৌঁছে দিয়েছিল গভীরতর স্তরে। সেই পরিচয়েরই বিবরণী 'ফুটফল্‌স অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় নিবেদিতার বন্দনা স্তোত্রটি তাঁর কবিসত্তার অনবদ্য নিদর্শন :

We hear them, O Mother
Thy footfalls
Soft, Soft, through the ages
Touching earth here and there
And lotuses left on thy footprints
Are cities historics
Ancient scriptures and poems and temples
Noble strivings, stern struggle for Right,

নিত্য শুনি, হে জননী
তোমার চরণধ্বনি
যুগ থেকে যুগান্তরে

ধরিত্রীকে স্পর্শ করে লঘু পদভরে
তোমার পায়ের চিহ্নে পদ্মের মতন
জাগে জনপদ পুরাতন
জাগে শাস্ত্র, দেবালয়, বিকশিত গান
ধর্মের কঠিন দ্বন্দ্ব, উত্তম মহান।
(অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ)

নিবেদিতার লোকান্তরের পর ১৯১৫ সালে 'মডার্ন রিভিউ,' 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির সংকলন প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে। নিবেদিতার সাহিত্যকৃতি বিচিত্র। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প, নাগরিক আদর্শ থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ-বন্যায় দুর্গতদের সম্পর্কে প্রতিবেদন, ধর্ম ও সমাজে নানা ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার পরিচয় সেখানে বিধৃত। কিন্তু সেই বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র বর্তমান—সে সূত্র হলো, গুরু-দেশ-জাতি।

সবশেষে আসি নিবেদিতার পত্র-সাহিত্যের কথায়। সম্প্রতি শঙ্করী প্রসাদ বসুর সম্পাদনায় দু'খণ্ডে তাঁর প্রায় এক সহস্র পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরিচিত জন, বন্ধু-বান্ধবী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদদের কাছে প্রেরিত পত্রগুলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেমন একটি যুগের দলিল তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও ফুটে ওঠে এগুলিতে। চিঠিপত্রেই মানুষ আন্তরিকভাবে ধরা দেয়—সেখানে খুঁজে পাই, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আবেগ, অভিমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও জীবনবোধ। সাহিত্য আম-দরবারের বস্তু, পত্র-সাহিত্য খাস-দরবারের। নিবেদিতার পত্রসাহিত্য থেকে তাঁর সাধারণ সাহিত্যের যে সহজ সত্যটি বোঝা যায় তা হলো, তাঁর আবেগ সর্বত্রই অকৃত্রিম। তাঁর পত্রসাহিত্যে সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে ভারতের বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সেই কাহিনী নিছক তথ্যসঙ্কলন মাত্র নয়, লেখিকার জীবনবোধের উত্তাপে, সৌন্দর্য-চেতনার সংস্পর্শে, কাব্যিক অন্তরঙ্গতায় আশ্চর্য শ্রীমণ্ডিত। শ্রীমতী

সরলা রায় নিবেদিতাকে ঠিকই লিখেছিলেন, "তোমার পত্র পড়া যেন ব্রাউনিঙের কাব্যের একটি অংশ পাঠ করা।"[৮৮]
'নর্স-সাগা'র অনুরাগিনী নিবেদিতা তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে রেখে গেছেন 'ইণ্ডিয়ান সাগা' এবং লিরিক সৌন্দর্যের অনুপম সংমিশ্রণ।

* * *

আকৈশোর সৌন্দর্যের উপাসিকা ভালবেসেছেন শিল্পকে, সাহিত্যকে—সর্বোপরি তাঁর গৃহীত দেশ ও দেশবাসীকে। সেই দেশের সাহিত্য-শিল্প পৃথিবীর সংস্কৃতির সাম্রাজ্যে জয়গৌরব লাভ করুক, জাতি মহত্তর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক—এই ছিল তাঁর কামনা। সেই দেশের মাটিতেই ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবরের প্রত্যূষে—শ্যামারজনী ও শুভ্র আলোর মিলনলগ্নে রেখে গেছেন তাঁর সূর্যকামনা শেষ কবিতায়:

> "The frail boat is sinking, but I shall see the sunrise."

পরক্ষণেই যেন ক্যানভাসে আঁকা এক আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকলা—অকস্মাৎ মেঘ সরে গিয়ে দূরে ফুটে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘার আভাস এবং একটি সূর্যরশ্মি খোলা গবাক্ষপথে পিতার আশীর্বাদের মতো তাঁর ললাট স্পর্শ করল। আর তখনই সেই দুরন্ত ক্লান্ত মেয়েটি শেষবারের মতো ভারতের বাতাসের সঙ্গে নিঃশ্বাস মিশিয়ে দিল। অদূরে জগদীশবসু দম্পতি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয়ত তখনও আবৃত্তি করছিলেন:
"পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে সকল প্রাণী—যারা শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তারা অবাধগতিতে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হোক।"

নিবেদিতা ও বাংলাসাহিত্য

একজন বিদেশীর পক্ষে অন্য দেশকে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে জানার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সেই দেশের ভাষা। ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলে লোকজীবনকে বোঝার সুযোগ সঙ্কীর্ণ এবং জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পাবায় জাতির প্রকৃত চরিত্র আবিষ্কার করা যায় না। বাহ্যিকভাবে বা অনুবাদেব মাধ্যমে অপর জাতিকে আংশিক বোঝার বা প্রায়শঃ ভুল বোঝার আশঙ্কাই সমধিক। এই কারণেই অপর দেশ বা জাতিকে জানার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত হলো. সে দেশের ভাষা আয়ত্ত করা।

জন্মসূত্রে নিবেদিতা আইরিশ। সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই লালিত ও বর্ধিত। ভারতের সঙ্গে তাঁর পবিচয়সূত্র কিছু পর্যটনকারীর বিবরণ (যার মধ্যে মিশনারী সম্প্রদায়েরই সংখ্যাধিক্য) অথবা ভারতীয় ধর্মসাহিত্য পাঠ। অনুবাদপাঠের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। (নিবেদিতা বলেছেন বুদ্ধজীবনী পাঠ করার পর তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'লাইট অফ এশিয়া'তেই তিনি বুদ্ধজীবনী পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতে আসার পর তিনি দেখেছেন 'লাইট অফ এশিয়া' প্রকৃতপক্ষে ললিত বিস্তরের প্রায় হুবহু অনুবাদ।) ভারতে আসার পূর্বে এখানকার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট।। নিবেদিতা যখন ভারতকে আপন কর্মকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে এখানে আসার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছেন, স্পষ্টভাষায় অসুবিধাগুলির কথা উল্লেখ করে। নিবেদিতা ভারতে এসে পৌঁছলেন ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার যাবতীয় ভার গ্রহণ করলেন

স্বামীজী। তাঁর ব্যবস্থাপনায় মঠের সন্ন্যাসী এবং কর্মীরা ভাষা ও ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছেন গোড়া থেকেই। ৩১ জানুয়ারি অর্থাৎ কলকাতায় এসে পৌঁছবার ১০ দিন পরে নিবেদিতা শ্রীমতী এরিক হ্যামণ্ডকে লিখেছেন, "গতকাল আমাকে বাংলা শেখানোর জন্য যাঁকে পাঠানো হয়েছিল (সম্ভবত মিশনের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শরৎচন্দ্র সরকার) তিনি আরম্ভ করলেন প্রথমেই আমার সামনে দু'খানা বই রেখে। বললেন, 'আমাদের প্রভুর বাণী এগুলি—যখন পারবে এগুলি অনুবাদ করবে।' আমি বললাম, 'আমাদের প্রভু মানে কে ? কৃষ্ণ?' সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার অসুবিধাটা ভুল বুঝেই উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ।' তখন আমি বুঝতে পারলাম।"[১] এপ্রিল মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে একটি পত্রে নিবেদিতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "মনে হচ্ছে বাংলা (শেখার) ব্যাপারে আমি একটি গবেট। এতদিনে তো আমার বাংলায় কথা বলার কথা।"[২]

নিবেদিতাকে অ, আ, ক, খ শেখানোর ভার যাঁর ওপরই ন্যস্ত করে থাকুন না কেন, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাবার ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। প্রায়ই তাঁর আলোচনার বিষয় হতো বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে রামপ্রসাদের গানগুলি গেয়ে শোনাতেন বাংলায়—অনুবাদ করে দিতেন ইংরেজিতে। সাতমাস পরে সেপ্টেম্বরে দেখি নিবেদিতা সর্বপ্রথম নিজে রামপ্রসাদের গান অনুবাদ করেছেন (অবশ্য তাতে স্বামীজীরও কিছু হাত থাকতে পারে)। নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন, "Here is a translation of a Bengali poem by Ramprosad :

What use is there in going to Benares
My Mother's Lotus feet
Are millions and millions
Of holi places."

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী

কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।

সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।[৩]

এক বছর পরে নিবেদিতা কতখানি বাংলা শিখেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৯ সালে একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক অনুবাদে তাঁর আত্ম-নিয়োগে। বাংলা সাহিত্যের অগাধ ঐশ্বর্য সম্পর্কেও তাঁর ধারণা তখন মোটামুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী হ্যামণ্ডকে চিঠিতে লিখেছেন: "বাংলায় অগাধ ঐশ্বর্য খুঁজে পাচ্ছি। মিঃ হ্যামণ্ড (বান্ধবী নেল হ্যামণ্ডের স্বামী) বাংলাটা যদি শেখেন তাহলে অনুবাদের কাজে বেশ ভাল উপার্জন করতে পারবেন। আমি এখন একটি নাটক অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি। আমি বুঝতে পারি না, এসব জিনিসের সঙ্গে আমাদের এতদিন পরিচয় হয় নি কেন? সব দিক থেকে, এ নাটকটি ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ডে'র সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। এটা কি সম্ভব, ইংরেজদের মধ্যে যারা বাংলা শেখে তারা সকলেই রাজকর্মচারী এবং মিশনারী? আর তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার জনসাধারণের সাহিত্য সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ আছে? আমি অন্ততঃ তা বিশ্বাস করি না।"[৪] উদ্দিষ্ট নাটকটি হল গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল', পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। মিশনারীরা বা সরকারী-কর্মচারীরা ছাড়াও যে অনেকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদের কথা জানতেন এবং তাঁদের অনুৎসাহ বা নীরবতা যে ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক, নিবেদিতা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।

এই জানুয়ারি মাসেই তাঁর বোস পাড়ার বাসাবাড়িতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে একটি চা-চক্রে মিলিত করেন। সেদিন চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন যা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল: "I can not forget the lovely poem 'Come peace' (Escho Santi)—with its plaintive minor air, that Mr. Tagore composed and sang for us."[৫] আর একটি চিঠিতে—রবীন্দ্রনাথ সেদিন তিনখানি গান গেয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু অন্য গান দুটি কি কি তা জানান নি। মনে হয়, এ

বিশেষ অধিবেশনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ যে গানটি রচনা করেছিলেন সেইটি নিবেদিতাকে অভিভূত করেছিল সব চেয়ে বেশি। শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন, গীতবিতানের কোনো গান 'এসো শান্তি' শব্দ দুটি দিয়ে আরম্ভ হয় নি। পূজা পর্যায়ের যে গানটি সেদিনের আসরে গীত হয়েছিল বলে তিনি অনুমান করেছেন তা হল :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে…।
এসো এসো শ্রান্তি হরা   এসো শান্তি সুপ্তিভরা
এসো এসো তুমি এসো   এসো তোমার তরী বেয়ে ॥[৬]

এর ক'দিন পরে—১৫ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে দেখতে পাই নিবেদিতার বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষার খবর। অবশ্য ঘটনাটা ঘটেছিল এর মাসখানেক আগেই। একদিন সকালে বোসপাড়ার বাসার উঠানে একজন গাড়িওয়ালার (সম্ভবত ঘোড়ার গাড়ি) হাঁক-ডাকে আকৃষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে নিবেদিতা দেখেন শ্রীমতী ম্যাকলাউডের পরিচিত এক ফরাসী বন্ধু এসেছেন তাঁরই কাছে—গাড়িওয়ালার সঙ্গে সেই বিদেশী ভদ্রলোকের বাদানুবাদ চলছে সম্ভবতঃ ভাড়া বা ওই রকম কিছু ব্যাপার নিয়ে কিন্তু বিপদ হল কেউই কারও ভাষা বোঝে না। নিবেদিতা লিখেছেন, "My French was hopeless but Bengali was sufficient to put his ghariwalla on the real track."[৭] নিবেদিতা ইতিমধ্যে যে বাংলা এবং সংস্কৃত মোটামুটি ভালই শিখেছেন, বোঝা যায় আর একদিনের একটি ঘটনার বিবরণীতে। সেদিন সরলা দেবী এসেছিলেন স্বামীজীর কাছে—নিবেদিতার উপস্থিতিতে উভয়ের মধ্যে কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। নিবেদিতা লিখেছেন, "It was all Sanskrit and Bengali but I seemed to understand the tones of the voice brought back the greatest moments we have ever known."[৮] শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের উত্থানপতনই তাঁর বোঝার কারণ ছিল না, সেই সঙ্গে ভাষার কিছু দখল প্রয়োজন—সেটা ইতিমধ্যে তিনি আয়ত্ত করেছেন। তাঁর

শিক্ষার সম্পূর্ণতর পরিচয় ফুটে উঠেছে ১ মার্চের পত্রে, "I speak on very limited topics yet, after all these months."[৯] বলা বাহুল্য 'সীমাবদ্ধ বিষয়ে' হলেও অন্য ভাষায় বক্তৃতাদানের ক্ষমতা আয়ত্ত করা সহজ নয়।

এই সময় স্বামীজীর বাংলা রচনার ভাষা ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনার বস্তু। ১৮৯৯ সালের ২১ মে তারিখের শ্রীমতী ম্যাকলাউডের কাছে চিঠিতে নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে সরলা দেবীর এ বিষয়ে আলোচনার কথা জানিয়েছেন। সরলাদেবী এবং অন্যান্যরা স্বামীজীর বাংলাভাষাকে 'a loose set' 'Vulgar' এবং আরো অনেক কিছু বলে মনে করেন—সেদিন কথা প্রসঙ্গে সরলাদেবী সেই কথাটা স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রতিক্রিয়া ক্ষোভ বা বেদনার নয়—তাচ্ছিল্যের, "Of course others are men and fools but a girl may be forgiven."[১০] প্রায় দুমাস পরে স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য গমনকালে জাহাজে স্বামীজী 'পরিব্রাজক' লিখছিলেন। পরিব্রাজকের বিষয়বস্তু ও ভাষা নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করতেন নিবেদিতার সঙ্গে। নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছেন. সে রচনায় ছিল "বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র রোষ, জনগণ সম্পর্কে আশা ও ভালবাসা, নিজ গুরুর প্রতি প্রোজ্জ্বল প্রেম, চতুষ্পার্শ্বের জীবন সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি এবং সর্বোপরি বাংলাভাষার উপর স্বেচ্ছাকৃত নিপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের লেখার মতোই বোঝা দুরূহ হয়ে উঠেছে—আর সেটা ছিল একটি বিশেষ অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই।"[১১] এই পত্রে নিবেদিতা বাংলালেখার সমালোচক হয়ে উঠেছেন।

আমরা জানি—নিবেদিতা সমগ্র ভারতবর্ষকে ভালবেসেছেন—ভালবেসেছেন বাংলাদেশকেও। সে ভালবাসায় আবেগ আছে, কিন্তু তা আবেগসর্বস্ব নয়, সাহিত্যপাঠ, অনুশীলন ও আলোচনার দ্বারা তিনি বিষয়ের অন্তরের মধ্যে প্রবেশের অধিকার অর্জন করে তার সত্য উপলব্ধি করেছেন। বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাহিত্যের

মধ্যে দিয়ে। যে গ্রামীণ সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর বাংলাসমাজের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে আন্তরিকভাবে জানতে না চাইলে নিবেদিতা তার সন্ধান পেতেন না। লৌকিক পূজা-অনুষ্ঠান, যথা—দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শীতলাপূজা বা গঙ্গা-সাগর মেলা—সকল কিছুর মধ্যে তিনি সামাজিক তাৎপর্যের সন্ধান করেছেন। (শীতলাপূজা বা গঙ্গাসাগর মেলার মতো লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানগুলিও যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে তাঁর কাছে, এমন কি সাধারণ একটি নিমগাছ জনজীবনে কতখানি মূল্যবাহী তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। চণ্ডীপাঠ, কথকতা, কীর্তন, বাউলের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ। বোসপাড়ার বাড়িতে কয়েকদিন ধরে চণ্ডীপাঠের আয়োজন করে পল্লীর মহিলাদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন।) দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। বঙ্কিমের 'আমার দুর্গোৎসব' রচনা এবং 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন: "কিঞ্চিদধিক ৩০ বছর আগে প্রখ্যাত বাংলা রোমান্স রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তরঙ্গমধ্যে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেখে সদ্যসমাপ্ত দুর্গাপূজার কালটিকে দেশমাতৃকার জাগরণ মুহূর্তরূপে কল্পনা করে মাতৃবন্দনা গান করেছিলেন। এই বাৎসরিক ঘটনা যা জাতীয়তার দিক থেকে সকলের কাছে সত্য তার ব্যাখ্যায় ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে তিনি কিছু সরে গেলেও সকল দেশবাসীর অন্তরের প্রার্থনাই প্রকাশ করেছিল। এই গানটিকে ঘিরে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে তা থেকে প্রমাণ হয় আজ এই গানটি প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি ব্যক্তির নিকট পরিচিত। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেশ-মাতৃপ্রতিমা অন্তরের গভীরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। Mother and Motherland—where ends the one and where begins the other? Before which does a man stand with folded hands, when he bows his head still lower and says with a new awe: My Salutation to the Mother!"[১২]

দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের

ইতিহাস' গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশনার সূত্রে। সদ্যসমাপ্ত গ্রন্থটির ইংরেজি সংশোধন ও পরিমার্জনার অনুরোধ নিয়ে দীনেশচন্দ্র গিয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। প্রায় এক বছর ধরে অশেষ অধ্যবসায় সহকারে নিবেদিতা সেটি সংশোধন করে দেন। পত্রাবলীতে এ সম্পর্কে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ১৯০৯ সালের ৩০ জুলাই মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা পত্র থেকে : "তোমরা কি কখনো দীনেশচন্দ্র সেনকে দেখেছ ? বোধহয় ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রীডার নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বাংলাভাষার একখানা অতি সুন্দর ইতিহাস লিখেছেন, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হবে। তিনি আমার কাছে আসেন প্রুফ পড়ার জন্য। বইখানি সত্যই চমৎকার। অনেক স্পষ্ট দোষ সত্ত্বেও, ভদ্রলোকের নিজের ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং ইতিহাস পদ্ধতির ওপর দখল আমার বেশ ভালো লেগেছে।"[১৩] এর পাঁচদিন পরে আবার পূর্বোক্তদের কাছেই চিঠিতে লিখছেন : "I am much occupied at present with a similiar question, owing to the fact that Dinesh Chandra Sen—the Tagore satellite—is publishing a wonderful book in English about the history of the Bengali Language and Literature."[১৪] এই চিঠিতে একটি কৌতুককর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা : "তুমি দেখলে অবাক হয়ে যেতে রুচির ব্যাপারে গ্রন্থকর্তা কি বিপাকে পড়েন। উনি পঙক্তিগুলি হুবহু অনুবাদ করবেন কিন্তু আমাকে চণ্ডীদাস পড়তে দিতেই যত আপত্তি। চণ্ডীদাস—এক আশ্চর্য কৃষককবি—একাদশ শতাব্দীর দান্তে। রামী নামক এক রজকিনীর প্রতি তাঁর তীব্র আদর্শ প্রেম। আচ্ছা, এ কাহিনী আমার খারাপ লাগবে কেন ? এক ব্রাহ্মণের রজকিনীর প্রতি আকর্ষণে স্থূলতার জন্যে ?" আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে নিবেদিতার অনুমান ঠিক নয়—ব্রাহ্মণের সঙ্গে রজকিনীর প্রেম দীনেশচন্দ্রের দ্বিধার কারণ ছিল না। এক মহিলার কাছে প্রেমের কবিতা পাঠ, তা দীনেশচন্দ্রের কাছে যতই 'নিকষিত হেম' হোক না কেন বাহ্যতঃ কামগন্ধ-প্রধান বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু নিবেদিতার এ শিক্ষা আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—সে কথা আমরা জানি।

এই পুস্তক সংশোধনের কিছু ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' থেকে। দীনেশচন্দ্র অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে গিয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে কুণ্ঠার সঙ্গেই বলেছিলেন, 'পুস্তকখানি খুব বড়।' নিবেদিতা কিন্তু সহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন, "তা হউক না, আমি যখন বলেছি তখন দেখে দেব।"

কিন্তু এই 'দেখে দেওয়া' যে কতখানি পরিশ্রম-সাপেক্ষ তা দীনেশচন্দ্রের রচনা থেকেই জানতে পারি। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "কোনো একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া ভাবিয়া খাটিতেন—এইভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোনোদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র। এমন নিঃস্বার্থ, আত্মপরবিরহিত প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণ উদাসীন নহে—একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণরূপে পাইয়াছিলাম।" দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন, "ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমায় বাধা করিয়াছিলেন।"

দার্জিলিঙে নিবেদিতা শেষ যাত্রা করার পূর্বমুহূর্তে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং দীনেশচন্দ্র স্বয়ং গিয়েছিলেন তাঁকে দু'খণ্ড উপহার দিতে। "পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আর কি বলিব!"

বাংলাসাহিত্যের এই নিঃশব্দ সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের কাছে বাংলার গৌরব ঘোষণা—তার সাহিত্য সম্পদকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করা। কিন্তু সেই সাহিত্যের ইতিহাসে যদি এমন কিছু থাকে

যাতে বহির্বিশ্বে বাংলার গৌরব ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে, বাঙালীর অমর্যাদার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে, তাহলে কিন্তু তিনি নির্মম। এমনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে আছে, ধনপতির প্রথমা স্ত্রীর উৎপীড়নে দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা বনে ছাগল চরাতে গিয়েছিল, এই অপরাধে তার জ্ঞাতিরা নির্দেশ দিল হয় তাকে অগ্নি বা বিষ পরীক্ষা দিয়ে আপন চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রমাণ করতে হবে অথবা এক লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নতুবা তার ভাগ্যে সমাজচ্যুতি। এই অংশ পাঠ করে নিবেদিতা জিদ ধরলেন, অংশটি বাদ দিতে হবে। সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত কাহিনী, ঐতিহাসিক তাকে বাদ দেন কেমন করে—দীনেশচন্দ্রের দারুন সঙ্কট। নিবেদিতার যুক্তি, "জোর করে তার সতীন [লহনা] তাকে ছাগল রাখতে বনে পাঠিয়ে তার ওপর জুলুম করলে, তাকে ঢেঁকিশালে শুতে দিলে, আধপেটা খাইয়ে চূড়ান্ত কষ্ট দিলে—সামাজিক বিচারপতিরা তার জন্য লহনার শাস্তি বিধান না করে কি না নিরপরাধ খুল্লনারই শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।... পৃথিবীর লোক এ কাহিনী পড়ে এটাকে কাজির বিচার বলে ঠাট্টা করবে।" নিবেদিতার পক্ষে সেটা অসহ্য।

অসহায় দীনেশবাবু যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করতেই নিবেদিতার প্রবল বাধা "নো, নো, নো, একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প হতে এটা ছেঁটে ফেলুন।"

দীনেশচন্দ্র অবশ্য অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন কিন্তু নিবেদিতাকে টলাতে পারেন নি। নিবেদিতা আর সব মেনে নিতে পারেন, নিজে চূড়ান্ত দুঃখভোগ করতে পারেন কিন্তু বাঙালী বা ভারতীয়ের সম্মান হানির কারণ হতে পারেন না। এমনি বহুবার। তাতে হয়ত সংশোধনের কাজ দুদিন বন্ধ থেকেছে কিন্তু নিবেদিতাকে বোঝানো সম্ভব হয় নি।

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্য-পুরাণের একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে—'শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি,

কোনোদিন জোটে, কোনোদিন রিক্তভাণ্ডে ফিরিয়া আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোনো, তাহা হইলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, কতদিন তুমি উলঙ্গ হইয়া কিংবা কেঁওদা বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলা তৈয়ারী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত খুসী হইবে।' এই ভাবসম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোনো অপূর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে, তাহা তো আমার মনেই হয় নাই। তিনি ঐ স্থান পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। কেবল 'আশ্চর্য, আশ্চর্য' এই কথাটি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'ভগিনী, এটাকে এমন কি জিনিস পেয়েছেন যে দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেরূপ হয়ে পড়েছেন?' নিবেদিতা সেই কবিতা হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ও দীনেশবাবু এটা একটা আশ্চর্য জিনিস।' দীনেশবাবু সেই আনন্দের রহস্য বুঝেছিলেন আর এক মেমসাহেব যিনি নিবেদিতার সঙ্গে থাকতেন (সম্ভবত ক্রিস্টিন) তাঁর কাছ থেকে। তিনি নিবেদিতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে দীনেশবাবুকে নিবেদিতার উল্লাসের কারণ বলেছিলেন, 'সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন'…ঐ কবিতার ভক্ত তাঁহার উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁহার মনে নাই, ঠাকুরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের কষ্ট যাহাতে নিবারণ হয়, তাহাই তাঁহার ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।"

গ্রাম্য ছড়ার প্রতি নিবেদিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর মতে, "বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে।" দীনেশচন্দ্রকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, "পল্লীগাথার মেঠো সুরে রাগিনী না থাকলেও কারুণ্য আছে। তাদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকলেও প্রাণ আছে।" তার অনুরোধে দীনেশচন্দ্র একবার আগমনী গায়ক এক বৈষ্ণব ভিখারীকে নিয়ে গিয়ে-

ছিলেন গান শোনাতে। তার কণ্ঠে 'গিরি গৌরী আমার এসেছিল' গানটি শুনে অভিভূত নিবেদিতার রুক্ষ বহির্বাসের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল এক সঙ্গীত-প্রেমিক কোমল-হৃদয় নারীসত্তা।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চাতেও নিবেদিতার প্রবল উৎসাহ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন নিবেদিতা এগিয়ে এসেছেন উৎসাহ-দাত্রীরূপে কারণ এর প্রয়োজন নিবেদিতার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে পাই :

How I wish you could be free of affairs and profession and devote yourself altogether to the great task of writing Science in Bengali, in which direction, I am told, your personal work will leave a permanent impression on the Mother-tongue. It is so necessary and this should be done.[১৫]

বাংলা নাটক অনুবাদের কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। আরও জেনেছি যে তিনি মিঃ হ্যামণ্ডকে বাংলা নাটক ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের সমকক্ষ বলে দাবী করে যে বাংলা নাটকটি অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন, সেটি হলো গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'। পূর্বে উল্লিখিত ১৮৯৯ সালের ৯ জানুয়ারির চিঠির ৫ দিন পরে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : I have begun to translate Mr. Ghose's 'Mad woman' (পাগলিনী বিল্বমঙ্গল নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র—সেই কারণেই হয়ত ইংরেজি অনুবাদে তিনি নাটকটির Mad-woman নাম স্থির করেছিলেন)। Here is a litle poem :

Rising and sinking on the great billows
Life is carried on in the current of love.
Where it is drifted to, who can tell?
Here it is sucked in[illegible]roaring whirlpool

Struggling and gasping the swimmer
emerges—
He sees an empty world !
But swiftly flows the river—already he
is floating on
Into what current does the current fall ?[১৬]

বিল্বমঙ্গল নাটকের প্রথম গান এটি :

ওঠা নামা প্রেমের তুফানে
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে
কোথায় নে যায় কে জানে ?
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ছুনিয়া দেখে ফাঁক
কোথাও তরতরে ধায় ভাসিয়ে নে যায়
টান পড়েছে কি টানে।

অনুবাদ যে নিবেদিতার নিজস্ব সেটা বোঝা যায় চিঠির একটি পঙক্তি থেকে, 'I wish Swami was here to translate it !'

ইচ্ছা থাকলেও তিনি পুরো নাটকটি অনুবাদ করতে পারেন নি, তবে ইংরেজিতে অনুবাদের পর সংশোধনের ভার গ্রহণ করেছিলেন, একথা জানা যায় ৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখে এ্যানি বেশান্ত সম্পাদিত 'লুসিফার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিল্বমঙ্গল' ইংরেজি সংস্করণের জন্য প্রকাশক আহ্বান করে একটি পত্র থেকে। অনুবাদটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "an able rendering into English by a veteran educationist with kind revision of Late Sister Nivedita.[১৭]" কিরণচন্দ্র দত্ত তাঁর গিরিশ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, মিণ্টের ভূতপূর্ব দেওয়ান রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, 'বিল্বমঙ্গল' অনুবাদ করেছিলেন এবং সেটি সংশোধন করে দেন ভগিনী নিবেদিত।[১৮]

গিরিশ নাটকের প্রতি নিবেদিতার দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন স্বামী

বিবেকানন্দ। ১৮৯৮-৯৯ সালে বেলুড়ে এবং উত্তরভারত পর্যটনকালে স্বামীজী প্রায়ই শোনাতেন গিরিশচন্দ্রের গান এবং নাটকের অংশ অনুবাদ করে। ক্রমশঃ গিরিশ-নিবেদিতা পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং নিবেদিতা গিরিশ নাটকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র তাঁর 'তপোবন' নাটক নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন : "পবিত্রা নিবেদিতা! বৎসে! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক হইতেছে, তুমি কোথায়? ...দার্জিলিঙ যাইবার সময় আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎস দেখা করিতে আইস না। শুনিতে পাই মৃত্যু-শয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার স্নেহপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিও।"

পূর্ববর্তী রচনায় আমি বিদেশে ভারতীয় নাটক অভিনয়ের ও সমাদর সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলার জন্য নিবেদিতার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি। বেনসনের কাছে লেখা চিঠিতে বিশেষ করে 'নল-দময়ন্তী' কাহিনীর প্রতি নিবেদিতা বেনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিরণ চন্দ্র দত্ত গিরিশের ভাষান্তরিত নাটকের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই 'নল-দময়ন্তী' ফরাসী-ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং 'বুদ্ধদেব চরিত' ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।[১৯] নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় নাটককে পাশ্চাত্ত্য দর্শক সমাজের কাছে উপস্থিত করতে—তাঁর সে বাসনা অপূর্ণ থাকে নি। হয়ত 'বিল্বমঙ্গল' অনুবাদের ফলে গিরিশচন্দ্র বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছিলেন অথবা নিবেদিতার প্রচেষ্টা বেনসন মারফৎ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। নিবেদিতা বিদেশে যেমন ভারতীয় নাটককে এবং নাট্যকারদের পরিচিত করতে চেয়েছেন, তেমনি বিদেশী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেও ভারতীয় নাট্যকারদের পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আমি ইতিপূর্বে ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের কথা উল্লেখ করেছি। গিরিশচন্দ্র

'ব্র্যাণ্ড' নাটক পড়ে উল্লসিত হয়েছেন, ইবসেন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন এবং ইবসেনের নতুন নাটক সংগ্রহ করে পড়েছেন, সে কথাও জানিয়েছি। নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, " 'ব্র্যাণ্ড' পড়ে গিরিশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত।" গিরিশের এই উচ্ছ্বাসের কারণ 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভারতীয় সমকালীন অবস্থা এবং চিন্তাধারার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য। ইবসেনের নাটকে যে সমস্যা অমীমাংসিত, আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশ তার সমাধানের উপরও আলোকপাত করেছিলেন—একথা নিবেদিতার পত্রাবলী থেকেই জানতে পারি।[২০] সুতরাং ইবসেনের এই নাটকটির প্রভাব গিরিশের কোনো নাটকের ওপর পড়েছিল কি না বিচার করে দেখা দরকার।

গিরিশ 'ব্র্যাণ্ড' পড়েছিলেন ১৯০০ সালে। ১৯০২ সালে তিনি রচনা করেছেন 'সৎনাম' নাটক। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর 'Girish Chandra Ghose and his dramas' বইতে সংবাদ দিয়েছেন 'সৎনাম' নিবেদিতার অনুরোধে রচিত।[২১] 'সৎনাম' প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৪ সালে বলে আমরা ধরে নিয়েছি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত গিরিশচন্দ্রের দেশাত্মবোধক নাট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৯০২ সালে নাটক রচনার পর রিহার্সাল শুরু হলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে 'গুলসানা' চরিত্রাভিনেত্রীর মৃত্যুতে রিহার্সাল বন্ধ হয়ে যায় এবং দু'বছর পরে পরিত্যক্ত নাটকটি ১৯০৪ সালের ৩০ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। তিনরাত্রি অভিনয়ের পর মুসলিম দর্শকদের তীব্র বিক্ষোভের ফলে অভিনয় চলাকালেই একদিন নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়। 'সৎনাম' গিরিশচন্দ্রের স্বদেশী-নাট্যমালা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সমকালীন অন্য নাটকের জাতগোত্রের সঙ্গেও সংযোগহীন।

ইতিহাসাশ্রিত এই নাটকের কাহিনী উপাদান গৃহীত হয়েছে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের ইতিহাস থেকে। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে দেখাতে চেয়েছেন ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ তীব্রতা লাভ করার কারণ হলো হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অধঃপতন ও জড়তা। প্রকৃত পক্ষে নাটকটি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুমানসিকতার প্রকাশ নয়। উনিশ শতকের

শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ মূলত মুসলিম শাসনকালকে অবলম্বন করেই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল (আনন্দমঠ তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন)। বাহ্যিকভাবে মুসলিম বিরোধী চেতনার অন্তরালে ছিল ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় জাগরণের ইঙ্গিত। নাট্যকার যে কালকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই কালে হিন্দু সমাজের জড়তার প্রতিক্রিয়ায় সংনামী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। হিন্দু সমাজ নিজস্ব জড়তার বর্মরূপে স্থাপন করেছিল ধর্মকে। ইবসেনের নাটকেও অনুরূপ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ১৮৬৬ সালে 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের পটভূমিকায় ছিল ১৮৬৪ সালে ডেন-মার্কের বিপদের দিনে নরওয়ে ও সুইডেনের স্থবিরতা-অক্ষমতার জন্য নাট্যকারের ক্রোধ ও লজ্জা। তারই ফল 'ব্র্যাণ্ড' নাটক, যা ইবসেনের জীবনীকারের মতে "fell upon our spiritual life like a bomb-shell."[২২]

'সংনাম'-এ লক্ষণীয় হল হিন্দুর বিকৃত ধর্মবোধ বা ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত দৃষ্টি-ভঙ্গী। গিরিশ পরিকল্পিত ফকীররাম চরিত্র এই ধর্মবোধকেই আঘাত করেছে এবং সনাতন ধর্মবুদ্ধির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তার কিছু পরিচয় দেখি মহান্ত ও ফকীররামের সংলাপের মধ্যে :

মহান্ত—কি ফকীর হাসছ কেন ?

ফকীর—আমোদে প্রাণ ভরে গেছে—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কাবুল হতে ফিরে আসছেন—তাই আনন্দে আর বাঁচছি না। এবার শুনছি কাবুল হতে শিক্ষা পেয়ে, আমাদের প্রতি স্নেহপ্রকাশ আরো কিছু বেশি পরিমাণে হবে।

মহান্ত—হিন্দুর প্রতি আরঙ্গজেব বাদশার আর স্নেহ কি ?

ফকীর—কেন মহান্তজী, তোমরা তো টোল করে করে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্বাণ লাভ কর। কেউ যদি মারে সে কিছু নয় স্বপ্নমাত্র। বাড়ি কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্নমাত্র।···একমাত্র পুত্রকে খেতে না দিয়ে হত্যা করে—সে-ও মায়া। খালি নির্বাণ হবার চেষ্টা করো। তা আরঙ্গজেব বাদশা সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত হিন্দুর নির্বাণ-

মুক্তি দান করবেন…

মহান্ত—ব্যঙ্গ রাখ। তোমার কথাটা কি ? আরঙ্গজেব বাদশা কি হিন্দুর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ?

ফকীর—আরে ক্রুদ্ধ কেন ? দেখছেন হিন্দুরা বহুকাল হতে সাধন করে করে মনুষ্যাকার বৃক্ষপ্রস্তর হয়ে সব সহ্য করছে, কেন না, শেষে মুক্তি লাভ করবে…

মহান্ত—আচ্ছা ফকীর, তুমি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিবারাত্র ব্যঙ্গ কর কেন ?

ফকীর—কে বল্লে ব্যঙ্গ করি! আ মরি মরি, এমন চমৎকার শাস্ত্র ব্যাখ্যা। মনে হয় শাস্ত্রকারেরা যদি জানতেন যে অর্জুনের প্রতি গীতার উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছ পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না তাহলে বোধ হয় শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং নিজেরা তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

মহান্ত—ফকীর বৃদ্ধ হলে, আজও বুঝলে না রজোগুণে মুক্ত হয় না।

ফকীর—আর তমোগুণে জড় হয়ে বাসনার হাত এড়ায়।

মহান্ত—মূর্খ, আমি কি সে কথা বলেছি ? তমোগুণে অলস জড় হয়। সত্ত্বগুণ উদয় হলে তবে পরমার্থ লাভ হয়।

ফকীর—আপনার কি ধারণা, যে হিন্দুরা সকলে সত্ত্বগুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে ? তা নয়, একবার চোখ খুলে দেখুন, ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন।…অনলস হয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হলে তবে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হবে। ভগবান বলেছেন কার্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না।…সৎকার্যের ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্বাণের অধিকারী…

বেদনার্ত কণ্ঠে ফকীর বলেছে—মাতৃভূমির দুঃখে অন্তত একজনও শোণিত দান করে হায় এমন সাহসী কেউ নেই…[২৩]

এর পাশাপাশি দেখা যাক ইবসেনের নাটকের সংলাপ। ইবসেনের নাটকের নামকরণ নায়কের নাম থেকে। নায়ক ব্যাণ্ড জীবনের সঙ্গে ধর্মের সংযোগসূত্রটি অন্বেষণ করেছে। অধঃপতিত সমাজ তার দুর্বলতার

সব দায় ধর্মও ঈশ্বরের উপর আরোপ করে নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন যাপন করছে। এ অবস্থা ব্র্যাণ্ডের কাছে দুঃসহ। ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে তার চিত্রকর বন্ধু ও বান্ধবীর আলাপ :

Brand —But I am going to the Wake

Agnes (বান্ধবী)—Who is going to be buried ?

Brand—The God you have just called yours···yes, every God of Serfdom, every God of daily drudgery· shall be laid out in Shroud and Coffin in the full light of day···It is time you understand, He has been ailing these hundred years.

Ejnar (বন্ধু)—Are you sick ?

Brand—Sound and fresh as fir tree···it is the present sickly generation that wants curing. You only care to laugh and play and trifle. You want to have all the anguish of the burden upon one who, they tell you, came and suffered the great penalty. He let Himself be crowned with thorns for you, so you are free to dance.

···I am not speaking as a Parson of the church ; I scarcely know whether I am a christian ; but I am certain of this, I am a Man and I am certain I can see the flaw that has drained the marrow out of this country···

···But this God is not mine ! Mine is a storm where yours is a wind, inexorable where yours is deaf. All-loving where yours is dull of heart. He is young as Hercules ; not an old God-father of sixty ! His is voice that pealed forth with lightning and terror

when he stood before Moses like a fire in the thorn-bush on Mont Hareb, a giant before dwarfs···(He) did wonders without number and would do them still, if this generation were not slack like you.

বন্ধু এজনারের সহাস্য ব্যঙ্গোক্তি—And now this generation is to be regenerated.

উত্তরে ব্র্যাণ্ডের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে দৃঢ়প্রত্যয়, সে যেন কোনো প্রত্যাদিষ্ট মানুষ –It will, mark you, I am certain. I know—that I am come into the world to heal the sickness and its flaws.[২৪]

এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই সৎনামের বৈষ্ণবীর কণ্ঠে :

নহে মম নিষ্ফল জীবন
কৌমারী কিঙ্করী এই হের উন্মাদিনী
হৃদে মোর জাগেন ঈশ্বরী
শক্তি দান করিবেন শক্তি সঞ্চারিণী···[২৫]

গিরিশচন্দ্র ব্র্যাণ্ড চরিত্রটিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয় জড়তাকে আঘাত করে জাতিকে পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে আদর্শ ব্র্যাণ্ড চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় সে চেতনার প্রকাশক ফকীররাম চরিত্র। অবশ্য যে চরিত্রের সংলাপ-নির্মিতিতে গিরিশকে কোনো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছেন 'নিজ অন্তঃপুরে'-ই। সেই সংলাপের উৎস স্বামী বিবেকানন্দ। ১৯০২ সালের ঠিক কোন্ সময়ে গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' রচনা করেছিলেন তা বলা যায় না। তবে ১৯০২ সালে রচিত গিরিশের দুখানি নাটকেই—'ভ্রান্তি' এবং 'সৎনামে' বিবেকানন্দ চরিত্রের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'ভ্রান্তি' নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ-তিরোভাবের অব্যবহিত পরের রচনা। মনে হয়, গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' রচনা করেছিলেন 'ভ্রান্তি'র পরে।। ঈশ্বর প্রেরিত মানবীরূপে বৈষ্ণবী চরিত্র পরিকল্পনা, যা ব্র্যাণ্ডের দ্বিতীয় সত্তার প্রকাশক এবং অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

যাকে 'হিন্দু জোয়ান অব আর্ক' বলে অভিহিত করেছেন, বাস্তব চরিত্র-অবলম্বনেই রচিত—স্বয়ং নিবেদিতার চরিত্রেরই ছায়া সেখানে প্রচ্ছন্ন। গিরিশ 'সৎনাম' নাটক রচনার প্রেরণালাভ করেছেন নিবেদিতার মাধ্যমে ইবসেন থেকে এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই সর্বপ্রথম ইবসেনের নিঃশব্দ প্রবেশ।

নিবেদিতার বাংলা কাব্য-মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে 'Kali The Mother' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'Two Saints to of Kali' রচনায় রামপ্রসাদ অংশটি। রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি সাধককেই শ্রেষ্ঠ কবি রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আলোকিত না হলে সুন্দর ও সজ্জিত শব্দে প্রকাশ করার মধ্যে সত্যদর্শন সম্ভব হয় না। মানুষ তাকেই অন্বেষণ করে যা সে জীবনে পেয়েছে কিন্তু উচ্চারণ করে নি—এমন কি স্বগতোক্তিও নয়। অন্যের কণ্ঠে সে বাণী শুনে সে বলে ওঠে—স্বাগত।" নিবেদিতা লিখছেন, "কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ঋষি। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের দীপ্তোজ্জ্বল খণ্ডাংশকে নির্বাচন করে বহুজনের করতালির প্রলোভনে সেগুলিকে মণিখণ্ডের মতো সাজিয়ে রত্নমাল্যে গেঁথে তোলা ঋষি কবির কাজ নয়—তিনি জীবনকে গ্রহণ করবেন সামগ্রিকভাবে, যে জীবন মূলতঃ ধূসর, পাংশু-মলিন উপাদানে গঠিত; সেই সঙ্গে কৃষ্ণতম এবং উজ্জ্বলতমকেও তিনি নেবেন এবং সমস্তের উপরে নতুন আলোকসম্পাত করবেন, যার ফলে দেখা যাবে জীবন যাদের যাতনা দিয়েছে, তারাও সুন্দর দেখেছে তাকে। যিনি শুধুই নাট্যকার তিনি বেছে নেন শুধু নাটকীয় ভাবটিকে কিন্তু ঋষি কবির কাছে সব কিছুই নাটকীয়। শিশুর সামান্য চাওয়া এবং ওথেলোর যে দারুণ বাসনা হত্যা করেছিল ডেসডিমোনাকে—বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে যোগের ক্ষেত্রে ঋষি কবির দৃষ্টিতে একটি অপরের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"[২৬]

সাধকজীবনের নিগূঢ় অনুভূতির সঙ্গে ঐক্য স্থাপিত না হলে তাঁর কাব্যের যথার্থ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। বাঙালী পাঠকের কাছে রামপ্রসাদের গান যতই স্বচ্ছন্দ হোক না কেন, ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন প্রকৃতির

পাঠকের কাছে তার আবেদন সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নিবেদিতা সে বিষয়ে সচেতন। তিনি তাঁর পাঠককে (স্বভাবতই বিদেশী) স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে সংস্কৃতির পটভূমিকায় কবির বিকাশ সেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে কবিকে সম্যকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। **Divina Comedia**-র প্রকৃত রস উপলব্ধির জন্য রোম ও ফ্লোরেন্সের সমগ্র ইতিহাস আয়ত্ত করা দরকার। দান্তের পক্ষে যে কথা সত্য রামপ্রসাদের পক্ষে তা অনেক বেশি সত্য। সেই কারণেই নিবেদিতা রামপ্রসাদের কাব্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় জীবন ও ধর্মের মূল তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেছেন। রচনাটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক নতুন ভাবে আলোকিত হয়েছে। শুধু ধর্ম-চেতনার দিক দিয়েই নয়, ভাবুকতা ও সৌন্দর্যানুভূতির স্পর্শে এবং উপলব্ধির গভীরতায় নিবেদিতার সাধিকা ও কবিমূর্তিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতা রামপ্রসাদকে দেখেছেন গণমানসের কবিরূপে। "মা গুন-গুনিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন শিশুকে কিংবা তার শেষ নিদ্রার শয্যাপাশে বুকফাটা কান্নায় লুটিয়ে পড়ছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে ফুঁসছে মানুষ কিংবা গুমরে উঠছে তার ভালবাসার পাত্রদের একটু ভালো রাখতে না পারার দুঃখে, যাঁর শক্তিতে লাঙল ঠেলছে কৃষক, দিনের আলোয় খেলছে শিশুরা, এঁর কাছে সব কিছু কানাকানি করে গেছে, দিয়ে গেছে জীবনরহস্যের সবটুকু।

তাহলে একথাই বলা যায়, প্রেরণাপুরুষের কণ্ঠে নয়, গণমানুষের অমার্জিত বিশাল হৃদয়েই নব ধর্মের অরুণোদয়।...

এভাবেই জাতি-জীবন থেকে আবির্ভূত হয়েছেন ঈশ্বরের মাতৃভাবের বাঙালী মহাকবি রামপ্রসাদ। তাঁর বাণী সাক্ষাৎ ভাবে প্রবেশ করেছে জাতির অন্তর্লোকে।"

নিবেদিতা রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁর আন্তরিক সরলতায়। লিখেছেন, "তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে আমরা সমগ্র সাহি-ত্যের এমন এক বিরাট কবির সাক্ষাৎ পাই—যাঁর প্রতিভা ব্যয়িত হয়ে-

ছিল শিশুর অনুভূতির উপলব্ধিতে।" পাশ্চাত্ত্য কাব্যে এই সুরের কবি ব্লেকের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও ব্লেককে কোনো মতেই তিনি রামপ্রসাদের উপরে স্থান দিতে পারেন নি।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে রামপ্রসাদের ঔদাসীন্যের দিক থেকে রবার্ট বার্ণস বা সাধারণ বস্তুর মহিমা ঘোষণায় হুইটম্যান রামপ্রসাদের সমগোত্রীয় কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান শিশুসত্তা তুলনাহীন। কোনো সাহিত্যেই এমন কোনো কবি নেই যিনি এই ক্ষেত্রে রাম-প্রসাদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন।

মাতা-সন্তান সম্পর্কের পটভূমিকায় ঈশ্বর ও মানবের বিচিত্র লীলা নিবেদিতা-চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সহজ অথচ মাধুর্যময় সাধনাই Kali The Mother গ্রন্থের প্রেরণা। মাতৃবন্দনার যে বিচিত্র সম্ভারে রামপ্রসাদ বাংলার সাহিত্য ও সাধনাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন তার মর্মগ্রাহী আলোচনায় নিবেদিতা প্রসাদী সংগীতের কয়েকটি অনুবাদ সংযুক্ত করে রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারই দু' একটি উদাহরণ উপস্থিত করি :

মা বলে ডাকিস না রে মন মাকে কোথায় পাবি ভাই
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশপুত্তল দাহ করে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।

Mind, stop calling 'Mother, Mother'
Don't you know she is dead ?
Else why should she not come ?
I am going to the bank of Ganges
To burn the grass image of my Mother
And then I will go and live in Benares.

যে দেশে রজনী নাই সে দেশের এক লোক পেয়েছি
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

From the land where there is no night
Has come one unto me.
And night and day are no nothing to me,
Ritual worship has become for ever barren,
My sleep is broken. Shall I sleep any more ?
Call you what you will—I am awake
Hush ! I have given back sleep unto him
Whose it was
Sleep I have put to sleep for ever.[২৭]

নিবেদিতার জীবনে প্রসাদী সঙ্গীত কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর রচনা ও পত্রাবলীতে এবং বক্তৃতায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ এলবার্ট হলের বক্তৃতার উপসংহারে নিবেদিতা বলেছেন, 'কালীকে মহান রামপ্রসাদের চেয়ে সুষ্ঠুতর ও সম্পূর্ণতর ভাবে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করতে তার আর কোনও সন্তান পারেন নি। তাঁর গানগুলি শক্তি সারল্য ও প্রকাশের গভীরতায় মাতৃরূপের অতুলনীয় উন্মোচন।' উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি গান উপস্থিত করেছেন :

Who knows what Kali is ? The Six Darshanas (Systems of philosophy) have not obtained her Darshana (Sight)······

কে জানে গো কালী কেমন

My mind don't be intolerent. I have looked and searched through Veda, Agama and Purana ; Kali, Krishna, Shiva, Rama—my Elokeshi (She with the dishevelled hair) is all there······

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি, যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী [২৮]

১৯০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ডক্টর চেনীকে একটি পত্রে লিখেছেন :

Meanwhile I want to say—you misread the Indian

message until you understand that it is not I but my Beloved, who will remain eternally. You don't want to be two eternally. On the contrary, what you want is an indissoluble union. This, however, is qualified by your longing to remain ever conscious of the Union :

I do not want to be sugar
I want to eat sugar.[২৯]

'চিনি হওয়া ভাল নয় মন আমি চিনি খেতে ভালবাসি।' এই পঙক্তিটি স্বামীজীর কাছে লেখা একটি পত্রেও ব্যবহার করেছেন।[৩০]

নিবেদিতার অনুবাদ কর্মের বিশিষ্ট নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প—'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' ও 'দানপ্রতিদান'। ১৯০০ সালের হেমন্তে ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি গল্প তিনটি অনুবাদ করেন। ২২ নভেম্বর শ্রীমতী ওলি বুলকে লিখেছেন, "লম্বা চিঠি লেখার জন্য বসলে আর চলবে না, কারণ আমি 'কাবুলিওয়ালা' শেষ করেছি এবং আজ রাত্রেই তার একটা মুখবন্ধ আমাকে লিখতেই হবে।"[৩১] ২৯ জুন পুনশ্চ লিখছেন শ্রীমতী বুলকে, " 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'ছুটি' (Leave of absence) ইংরেজি করা হয়ে গেছে এবং 'দান-প্রতিদান'-ও (Giving and Giving in return) তৈরী—শুধু শেষটুকু (last finish) বাকি।"[৩২]

প্রথম দুটি—'কাবুলিওয়ালা' ও 'ছুটি' গল্পের প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণ আত্মগত প্রেরণাজাত। সুদূর আফগানিস্তানবাসী রহমতের বঙ্গবালিকার প্রতি উৎসারিত স্নেহধারা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন পিতৃহৃদয়কেই প্রকাশ করেছে। এই বাৎসল্য আর একটি বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়কে স্পর্শ করবে এটাই স্বাভাবিক। শ্রীমতী উইলসন নিবেদিতার অন্তর্জগতের কথাটি জেনেছিলেন তাঁর কাছ থেকে "ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে দাম্পত্য জীবনের জন্য আমার অভাববোধ কখনো হয় নি—অভাববোধ শুধু সন্তানের জন্য।"[৩৩] নিবেদিতার রুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহ উৎসারিত হয়েছে অন্যের সন্তানের প্রতি। স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্য-

গমনকালে জাহাজে এক মিশনারী দম্পতির চারটি সন্তানের প্রতি তাঁর মাতৃমমতার পরিচয় স্বামীজীর রচনার মধ্যেই পাই। তারপর তিনি আলঙ্কারিক অর্থেই নয়, আক্ষরিক অর্থেই লোকমাতা হয়ে উঠেছেন। 'ছুটি' গল্পের মধ্যেও সেই মাতা-সন্তানের বিচ্ছেদ কাহিনী যা ছিল নিবেদিতার অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্লেগ রোগাক্রান্ত কলকাতার বস্তিতে সেবাময়ী নিবেদিতা কত ফটিকের শয্যাশিখরে বসে শুনেছেন সদ্য-সন্তানহারা মায়ের কান্না। তাদের আর্তনাদের সঙ্গে মিশেছে তারও মাতৃহৃদয়ের হাহাকার। এমনি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন তিনি নিজেই। মার্চের এক উত্তপ্ত দিনে এক দরিদ্রের কুটিরে প্লেগরোগাক্রান্ত একটি বালকের সেবা করছিলেন তিনি। সংক্রামক রোগ—সুতরাং বাড়ির সকলকে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু একটি স্ত্রীলোক সব নিষেধ উপেক্ষা করে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বার বার ঘরের মধ্যে আসছিল। নিবেদিতা তাকে শান্তবাক্যে যখন ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন, সে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উদ্গত অশ্রু প্রশমিত করে একান্ত অনিচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গেল। নিবেদিতা যখন জানতে পারলেন ঐ স্ত্রীলোকটিই মুমূর্ষু বালকের মা তখন তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি তাকে ফিরিয়ে এনে বালকটিকে বাতাস করার অনুমতি দিলেন। প্রবল জ্বর ও অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ছেলেটি চোখ চেয়ে নিবেদিতাকে মা মনে করে তাঁর দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠছিল, 'মা, মা, মাগো, মা আমার'। কখনো কখনো নিবেদিতার হাতখানা টেনে মুখের কাছে নিয়ে মায়ের স্পর্শলাভের সুখটুকু অনুভব করছিল—আবার কখনো বা নিবেদিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নিজের রোগযন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করছিল। নিবেদিতার মাতৃসত্তা ভালবাসার এই মর্মস্পর্শী মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠেছে। তিনি একান্ত সঙ্গোপনে মা ও সন্তানের নিবিড় অন্তরঙ্গতার সুখটুকু সত্যকার মাকে বঞ্চিত করে উপভোগ করেছেন এবং মার্জনা-ভিক্ষা করেছেন অন্তরে—"Sweet unknown mother, forgive me these thefts of love, that rent the veil of graciousness so perfect, an adoration so deep."[৩৪]

'দান-প্রতিদান' একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারের ঘরোয়া কাহিনী। দূর সম্পর্কিত দুই ভ্রাতার সৌহার্দ্য, ছলনা ও মহানুভবতার এক মর্মস্পর্শী গল্প। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নিবেদিতার সমস্ত অনুবাদকর্মই অভারতীয় পশ্চিমী পাঠকের জন্য। তিনি তাদের সম্মুখে যেমন বাঙালীর সুখদুঃখের জীবনে ভালবাসা ও মহত্ত্বের কাহিনী উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের দেশকাল নিরপেক্ষ চিরন্তন আবেদন ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিবেদিতার অভীষ্ট —মহৎ ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জগতের পরিচয় গড়ে তোলা এবং সে কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্তির ১৩ বছর আগে।

সেকালের দেশীয় লোকজীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলিও নিবেদিতার কাছে তাৎপর্যময় হয়ে উঠত—অতি সাধারণ লোকসঙ্গীত, লোকগাথাও অশেষ মূল্যবান বলে মনে হতো। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেকালে হরিসঙ্কীর্তনের দল রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াত 'হরি বল, হরি বল ভাইরে/ কলিযুগে হরিনাম বিনা গতি নাই রে/'—সে গান কজনেরই বা শ্রুতি আকর্ষণ করে? বাঙালী সংস্কৃতির সেই রূপ কিন্তু নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছে। গভীর শ্রদ্ধায় প্রশান্ত সন্ধ্যার সেই সঙ্গীতধ্বনি :

> Call on the Lord !
> Call on the Lord
> Call on the Lord, little brother !
> Than this name of the Lord
> For mortal men
> There is no other way.[৩৫]

নিবেদিতার কাছে অতিরিক্ত অর্থবহ হয়ে উঠেছে। আবার মেয়েদের ব্রতকথার মধ্যেও তিনি পেয়েছেন বাঙালীর সংস্কৃতি ও রুচির অনন্য পরিচয় : **From the arms of husband and sons / When the Ganges is full of water/May I pass to the feet of the Lord** (স্বামীর কোলে পুত্র দিয়ে / আমার যেন মরণ হয় এক

গঙ্গাজলে।)[৩৬]

প্রাচীন পারসিক প্রেমসঙ্গীতের প্রভাবে রচিত বলে নিবেদিতা নিচের গানটির পরিচয় দিয়েছেন :

Four eyes met, there were changes in two souls
And now I can not remember whether he is a man and I a woman
Or he a woman and I a man. All I know is
There were two, Love came and there is one[৩৭]

প্রকৃত পক্ষে গানটি বৈষ্ণব পদকর্তা রামানন্দ রায়ের একটি পদ। এই পদ-রচনায় পারসিক প্রভাব বিতর্কিত বিষয় :

পহিলহি রাগ অনঙ্গ-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের কথা আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র একই সঙ্গে বুদ্ধগয়া গেছেন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁর অতিথি হয়ে নিবেদিতা শিলাইদহে থেকেছেন। আবার নিবেদিতার আমন্ত্রণেও রবীন্দ্রনাথ বোসপাড়ার বাসায় অনেকবার এসেছেন। কোনো কোনো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে নিবেদিতার কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন, সে কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। কবি 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আর এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যে উপকার পাইয়াছি, এমন কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়ে না।" এই উপকারের বস্তুগত প্রমাণ উপস্থিত করা কঠিন, তবে রবীন্দ্র-চিন্তার বিবর্তনে নিবেদিতার যে একটি ভূমিকা ছিল সে কথা কবি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির ওপর নিবেদিতার প্রভাবের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের গানে

দেশের মাতৃমূর্তি কল্পনা এবং বন্দনা চোখে পড়ে না বরং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছার কথা আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রজীবনীতে ব্যবহৃত পুলিন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। ১৮৯৬ সালের লেখা 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী' গানটি রচনার পটভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে লিখেছিলেন, "একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র বসু মল্লিক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা মিশ্রিত সুরের গান রচনা করবার জন্য আমার প্রতি তাঁদের বিশেষ অনুরোধ। আমি স্বীকার করে বলেছিলুম, এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয় যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হতো তাহলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক, আমার পক্ষে তাতে সঙ্কোচের কারণ থাকত না কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ গর্হনীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। এ গান পূজা-মণ্ডপের যোগ্য নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেন না এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটাতে সুপরিচিত ভাবে মর্মজ্ঞান হবে না।"[৩৮]

এই প্রসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্মরণ করতে পারি। ১৯৩৭ সালে যখন 'বন্দেমাতরম্'-এর জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয় তখন রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহেরুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "I freely conceede that the whole of Bankim's 'Bande-mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem suspectibilities, but a national

song though derived from it which has sponteneously come, to consist only of the first two stanzas of the original poem. need not remind us every time of the whole of it…"[৩৯]

অর্থাৎ প্রথম দুটি স্তবক রেখে বাকি অংশ বর্জন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কারণ বাকি অংশের মধ্যে এমন কিছু আছে যা একান্তভাবে হিন্দুধর্মচেতনা অনুসারী এবং যাতে মুসলিম সমাজে ভুল বোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারে বর্জিত অংশের মধ্যে পাই :

(১) বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

এবং (২) ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীং ইত্যাদি।

সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু বঙ্গভঙ্গের যুগে বাংলার মাতৃমূর্তি কল্পনা করেছেন দুর্গা নয়, কালীর ভাবমূর্তি অনুসারে এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে ডাক দিয়েছেন বঙ্গভঙ্গ রোধে—

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী…
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁহাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের ধারা ললাট-নেত্র আগুন বরণ…
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী…
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও তরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথ কালীমূর্তিকেই মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন যাঁর একহাতে খড়্গ, অন্যহাতে বরাভয় এবং তাঁকে তিনি স্থাপন করেছেন সোনার

মন্দিরে। কালীভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধের কথা আমরা জানি। রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি কালীকে ভাব-কল্পনারূপেও গ্রহণ করতে অনিচ্ছা জানিয়েছিলেন একথাও আমাদের অবিদিত নয়। অথচ সেই আলোচনার বহু আগে সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে, সেই দেবীমূর্তিকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন যে কাব্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ভাবচেতনার দ্যোতক নয়—তার মধ্যে দিয়ে জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের প্রয়াসও বর্তমান।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কালীর যথার্থস্বরূপ আমাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু-আকারে প্রতিভাত হইতেছেন কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই। তাই আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি—কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন।"[৪০] কিন্তু এই গানে তিনি শুধু মৃত্যুরূপা কালীকেই দেখেন নি—দেখেছেন তাঁর "হৃদয় হরণী" রূপ, "তুই নয়নে স্নেহের ধারা" এবং "হৃদয়মাঝে" শুনে-ছেন তাঁর "অভয়বাণী"। এই ভক্তের দৃষ্টি তিনি লাভ করলেন কেমন করে?

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন, "বঙ্গভঙ্গের সময় রচিত গান-গুলির অধিকাংশই এই তীব্র আবেগের প্রেরণায় উৎসারিত। এইসব গানের ভিতর দিয়া কবি দেশকে কেবল দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করিলেন না—দেশবাসীর অন্তরে ভাবের জোয়ার বহাইলেন ও শক্তির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিলেন।"[৪১]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি নিবেদিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছেন সে উপকার অন্যের কাছ থেকে পান নি। সে উপকারের স্বরূপ কি? 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন, "তিনি [নিবেদিতা] যখন বলিতেন **Our people** তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।" এবং "আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন

তাহাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ ব্যাপক সত্তাকে মন দিয়াই দেখি। চোখ দিয়া দেখি না।"

নিবেদিতার এই "চোখ দিয়া দেখা" এবং "কণ্ঠের সুর" কবির দৃষ্টি ও কণ্ঠকে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং কবির মধ্যে যে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেছিল তারই স্বাভাবিক ফল বঙ্গভঙ্গ যুগের গানগুলি—একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে বলা যেতে পারে।

গত ৩০ নভেম্বর ১৯৮২, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী রত্নাবলী রায় তাঁর অনুমান জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে রাজার পতাকায় পদ্ম ও বজ্রের ব্যবহার নিবেদিতার প্রভাবজাত। নিবেদিতা ১৯০৯ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে জাতীয় পতাকার প্রতীকরূপে পদ্মের মাঝখানে বজ্রের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের বিবরণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটক রচনা করেন ১৯১০ সালের আশ্বিন মাসে। সে সময় নিবেদিতার রচনাটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং শ্রীমতী রায়ের অনুমান যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'র নায়কচরিত্র পরিকল্পনায় নিবেদিতা চরিত্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে গোরার সঙ্গে নিবেদিতার যোগসূত্রের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কবি লিখেছেলেন, "You ask me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest in Shilaidah, and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora—She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You wont find it in Gora as it stands now—but I introduced it in my story. I told her in order to drive the point deep into her

mind."[৪২]

এখানে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ বললেন গোরা গল্পটি কিন্তু কিছু পরিবর্তন করে, দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন ঘটালেন কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে, গোরা তার বিদেশীয়ত্বের জন্য সকলের কাছে প্রত্যাখ্যাত এবং তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ এ পরিবর্তন ঘটালেন ইচ্ছা করেই—in order to drive the point deep into her mind. এরই প্রতিক্রিয়া নিবেদিতার ক্রোধ। নিবেদিতা হিন্দুধর্মাবলম্বী বিদেশিনী ; ভারতের সমাজে সর্বত্র না হলেও অনেকের কাছে সাদরে গৃহীত। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা, এমন কি সারদাদেবীর কাছ থেকে তিনি যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে তাঁর অন্তর পরিতৃপ্ত (প্রসঙ্গত একটা কথা স্মরণ করিয়ে দি, বাহ্যিক-ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা যে কতখানি অসার তা জানা যাবে নিবেদিতার জীবনী, বিশেষ করে তাঁর পত্রাবলী থেকে)। হিন্দুধর্মের উদারতা সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়। গোরার মধ্যে নিবেদিতা আত্মপ্রতিকৃতি খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই কাহিনী পরিণতিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, প্রাচ্য উদারতার ধারণায় কঠিন আঘাত লেগেছিল, এমন অনুমান অবশ্যই করা যায়। সাধারণভাবে হিন্দুর এই অনুদারতার চিত্র পাশ্চাত্ত্য জগতে হিন্দুসমাজকে হেয় করতে পারে এমন আশঙ্কার ফলেও তিনি বিচলিত হতে পারেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আচরণ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় গোরার প্রতি-কৃতিতে তিনি কাকে গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই বাস্তব গোরার প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলেন পরিণতি বদল করে। এখন দেখা যাক, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য। গোরা নিবেদিতার মতই আইরিশ পিতা মাতার সন্তান। হিন্দুপরিচয়ে লালিতপালিত হয়ে সে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অতিমাত্রায় নিষ্ঠাবান ভক্ত ও প্রচারক। তার ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বভাবজাত প্রবলতা। রবীন্দ্রনাথ গোরার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তার কিছু উদ্ধৃত করছি :

"গোরা বলিল বটে 'আমার অনুরোধ'—এ ত অনুরোধ নয়, এ যেন

আদেশ। কথার মধ্যে এমন একটা প্রকাণ্ড জোর যে তাহা অন্যের সম্মতির অপেক্ষা করে না।”

“গোরার চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধির তীক্ষ্নতার সঙ্গে, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে এবং মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্মভেদী প্রবলতার সঙ্গে তাহার কথাগুলি মিলিত হইয়া একটা সজীব ও সত্য আকার ধারণ করিয়াছিল।”

“ললিতা কহিল, ‘উনি বড় বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন, আর আপনারা সকলেই তাতে যেন সায় দিয়ে যেতেন—তাই দেখে আমার একটা রাগ হতে থাকত।···আমি যদি দেখি, কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করছে, সে আমি একেবারেই সইতে পারিনে’।”

“এইরূপ আলোচনায় গোরা প্রায়ই যুক্তিপ্রয়োগের দিকে যায় না—সে খুব জোরের সঙ্গে আপনার মত বলে। তেমন জোর অল্প লোকেরই দেখা যায়।”

“বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—‘গোরা, তোমার ও আমার প্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। সেটা এতদিন কোনমতে চাপা ছিল। যখন মাথা তুলতে চেয়েছে, আমিই তাকে নত করেছি, কেন না আমি জানতুম, যেখানে তুমি কোন পার্থক্য দেখ, সেখানে তুমি সন্ধি করতে জান না, একেবারে তলোয়ার হাতে ছুটতে থাক। তাই তোমার বন্ধুত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে এসেছি’।”

ঠিক এই বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ‘ভগিনী নিবেদিতা’ প্রবন্ধে, নিবেদিতার চরিত্র বিশ্লেষণে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্তভাবে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত।

যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সহিত মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি, তাঁহার সহিত আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নয়। সে যেন বলবান আক্রমণের বাধা।"

"তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল এবং সে জোর যে কাহারও উপর প্রয়োগ করিতেন না, তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত প্রাণ দিয়া চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতা যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত।"

অনুরূপ অভিজ্ঞতা দীনেশচন্দ্র সেনেরও—"তাঁহার মতগুলি এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি কোন মতেই প্রতিকূল হইলে আমার মত মানিয়া লইতেন না।"

নিবেদিতা নিজেও কি তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না? ১৯০৫ সালের (২৪ আগষ্ট) একটি চিঠিতে তিনি বান্ধবী ম্যাকলাউডকে লিখছেন, "**Do you know, I am growing more and more sure that I am a man in disguise? I don't seem a woman at all!**"[৪৬]

প্রবল উগ্রতা সত্ত্বেও দেশ ও দেশবাসীর প্রতি গোরার মমত্ববোধই চরিত্রটিকে মহিমান্বিত করেছে। "দেশের ঐশ্বর্য দেশের মধ্যেই সঞ্চিত আছে সেইটে আমি তোমাদের জানাবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছি" গোরার এই উক্তি কি নিবেদিতারই আত্মপরিচয় নয়? "ভারতবর্ষকে আপনি আপনার সহজ বুদ্ধি, সহজ হৃদয় দিয়ে দেখুন, একে আপনি ভালবাসুন। ভারতবর্ষের লোককে যদি অব্রাহ্মণ বলে দেখেন, তাহলে তাদের বিকৃত করে দেখবেন...ঈশ্বর এদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন; এরা নানারকম করে ভাবে, নানারকম করে চলে, এদের বিশ্বাস, এদের সংস্কার নানারকম। কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে; সমস্তেরই ভিতরে এমন একটি জিনিষ আছে, যা আমার জিনিষ, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিষ।" অথবা "সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে

ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ।" আমরা যেন গোরার কণ্ঠে নিবেদিতাকেই কথা বলতে শুনি। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার মধ্যে 'গভীরভাবে ভাবুক' এবং 'প্রবলভাবে কর্মীর' যে পরিচয় পেয়েছিলেন সেখানেও দেখি সেই ভাবুকতা ও কর্মসাধনার কেন্দ্রে ছিল ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতাব আবেগদীপ্ত ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিষ তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি।"

"যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে নাই। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি, তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুধুমাত্র মনে মনে ভাবিতেন না।...ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ।"

"লোকসাধারণ নিবেদিতাব অন্তরের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না।...তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম, কথাকাহিনী, পূজাপদ্ধতি, শিল্পসাহিত্য, তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্যপদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সহিত খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন।"

পিয়ার্সনের যে প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার 'গোরা'র কাহিনী শোনার প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো, "What connection had the writing of Gora with Sister Nivedita." স্বাভাবিক কারণেই পিয়ার্সনের মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল কারণ এর মধ্যে তিনিও নিবেদিতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মূল প্রশ্নটির

সরাসরি উত্তর না দিয়ে শুধু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বাকিটুকু ছেড়ে দিয়েছেন পিয়ার্সনের তথা পাঠকের সিদ্ধান্তের ওপর। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেই আমরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করতে পারি এবং গোরা চরিত্র পরিকল্পন নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারি। সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যায় হিন্দু সমাজে নিবেদিতা কতখানি গৃহীত হবেন বা হতে পারেন সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর প্রবেশাধিকার যতখানি সহজ ছিল হিন্দু সমাজে ঠিক ততখানি নয় বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল। সেই সন্দেহটিকে তিনি প্রকাশ করেছেন কাহিনী-পরিণতি পরিবর্তন করে কিন্তু নিবেদিতার মনে এ সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ ছিল না। তিনি জানতেন বিদেশীদের আচার-আচরণ জীবনযাত্রাপ্রণালীর পার্থক্য, শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের অবিশ্বাস ও ঘৃণার কথা, যা তিনি কঠিন সাধনাতেই উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। ১৮৯৯ সালে জুন মাসের শেষে পাশ্চাত্য গমনকালে জাহাজে বসে বিগত আঠারো মাসের ভারতবাসের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "Received by the mother land as one of her children, I have been permitted to see her, as it were, without her veil. I have been allowed to share in the life of the people. Kindness has been showered upon me. Neither poverty nor worship has been hidden from me." সেই জীবনের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির রূপ নিবেদিতার কাছে উন্মোচিত হয়েছে "in fact, like a gigantic tree which is constantly embracing a wider and wider area with its roots." সর্বোপরি তিনি ভারতীয় নারীত্বের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জাতির মহত্তর আদর্শের রূপ, জননীত্ব, যা একমাত্র ভারতবর্ষেই পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায়। "It is to women, then —who have wielded with such power those great impulses of purity, remenciation and spirituality

upon which India of to-day is built...”[৪৪] সেই পবিত্রতা, ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিমাস্বরূপিনী সংঘজননী সারদাদেবীর শান্তিময় আশ্রয় নিবেদিতার কাছে উন্মুক্ত। সেই আদরিণী মাকেই পত্রে লিখেছিলেন, “মাগো, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ তুমি। তোমার ভালোবাসা হলো এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল কামনা করে না।...তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি।”[৪৫] সে অনুভূতি অস্বীকার করবেন তিনি কি করে? এই জননী-মূর্তির চকিত আভাস গোরার আনন্দময়ী চরিত্রে।

নিবেদিতাকে নিয়ে বিশিষ্ট বাঙালী কবিরা বহু কবিতা রচনা করেছেন। নলিনীকান্ত সরকার, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিদের রচনা উল্লেখের দাবী রাখে। উপন্যাস ও নাটকের মধ্যেও খুঁজে পাই নিবেদিতা চরিত্র। সেকালের বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘অভিনেত্রীর রূপ’-এ (নাট্যায়িত ও অভিনীত হয়েছিল) সিস্টার অপরাজিতা নামে একটি নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। ‘অভিনেত্রীর রূপ’-এ সিস্টার অপরাজিতার সংস্পর্শে এসে চন্দ্রা নামে এক পতিতা নারী সুস্থ জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁর জীবনীকার হরীন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন সিস্টার চরিত্রটি বাস্তবে ভগিনী নিবেদিতা এবং চন্দ্রা পূর্ণিমা নামে এক ধাত্রী।[৪৬] গিরিশচন্দ্রের নাটকের চরিত্র পরিকল্পনায় নিবেদিতা চরিত্রের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। প্রবন্ধ সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেনের রচনার বিষয় পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। একটি অমূল্য হীরকখণ্ড রেখে গেছেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে এটিতে শিল্পী যেন তুলি-কলম একই সঙ্গে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন :

"প্রথম তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কন্সালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপসন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা; ঠিক যেন পাথরের গড়া তপস্বিনী মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হলো যেন তুই কেন্দ্র থেকে তুই তারা এসে মিলেছে। সে যে কী দেখলুম কি করে বোঝাই!

"আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার ওপর নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকে পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া, সাহেব মেম গিস গিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব, কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই বা কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে, ফ্যাসানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তার কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উডরফ, ব্রাণ্ট এসে বললেন, 'এ কে?' তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

"সুন্দরী সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"[৪৭]

তারপর বহুকাল কেটে গেছে। বাংলাসাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সেদিন অন্ধকারের মধ্যে বসে যিনি আলোর তপস্যা করেছিলেন—বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার শিল্প, বাংলার সাহিত্যের

সমুন্নতি ছিল যাঁর 'ধেয়ানের ধন'—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া পাথরের তপস্বিনী মূর্তিটিকে, সেই সেবারূপিণী জননী মূর্তিটিকে, সেই দৃপ্ত নারীত্বের ভাস্বর মূর্তিটিকে আমাদের সাফল্যের উৎসবে উপযুক্ত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কি ?

অতীত-বিস্মৃতিতেই বোধহয় বাঙালীর জন্মগত অধিকার !